ছায়াবাস্তব

জাকির তালুকদার

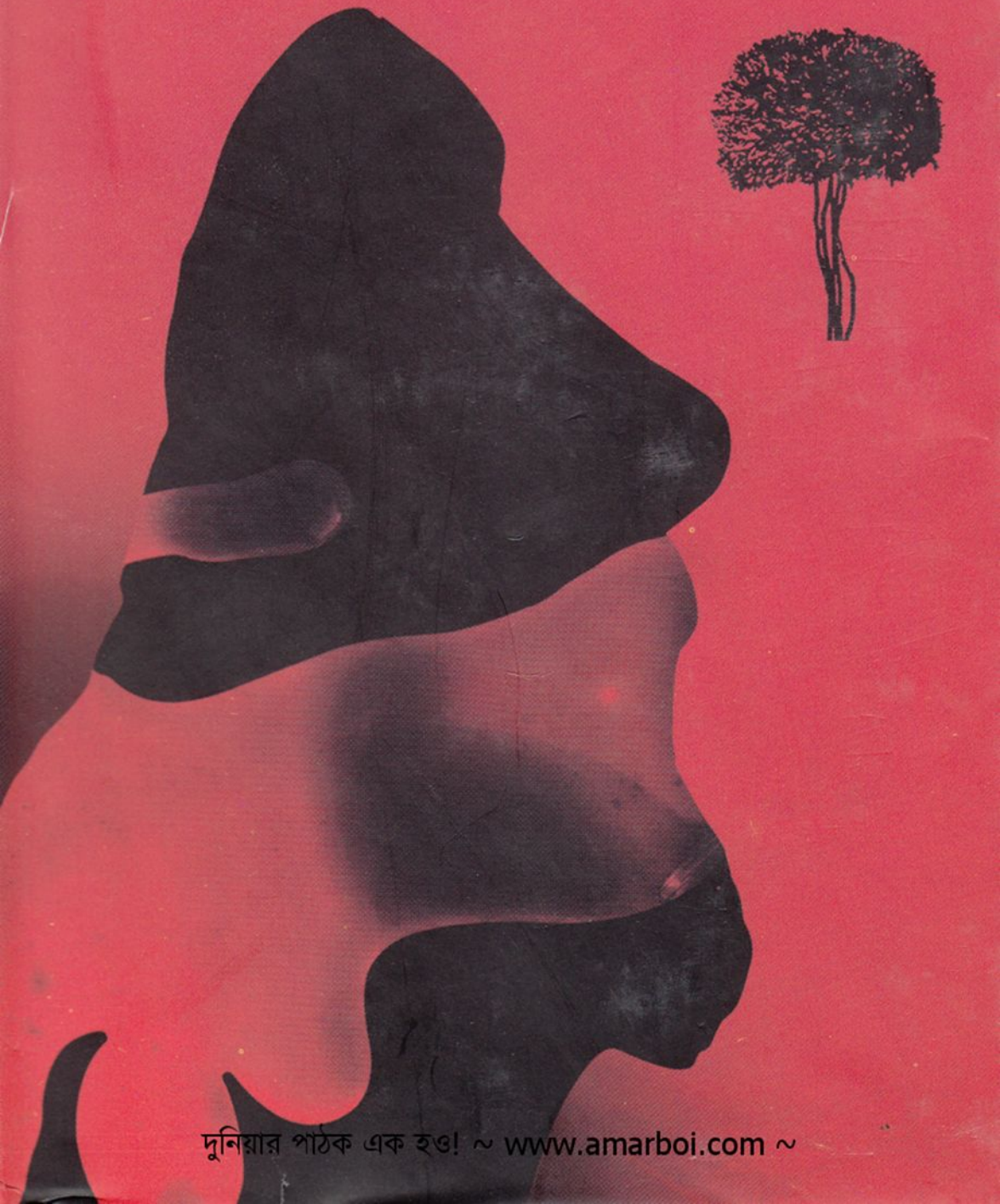

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদল সেই নিচুজমি বা গর্তের দিকে এগোতে গিয়ে সশব্দে অবাক হওয়ার মতো করে দেখতে পায়, সেই রক্ত এবং কাদামাখা ডেডবডির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে তার মা। মা কখন নিঃশব্দে পৌঁছে গেছে লাশের পাশে! বাদলের মতো শাজাহানও একটু থমকায়। তারা দুইজনে এগিয়ে চলে লাশের দিকে। এক, দুই, তিন করে ধাপ গুনতে থাকে বাদল। তার হাঁটুতে জোর নেই। মনে হচ্ছে অনন্ত সময় ধরে সে হাঁটছে লাশের পাশে পৌঁছানোর জন্য। এই পথ শেষ হচ্ছে না কেন? মা কীভাবে এত চটজলদি পৌঁছে গেল সেখানে? তারপরে মনে হয়, মায়েরা মা বলেই এমনটা পারে। কিন্তু সে ভাই হয়ে পারছে না কেন? শাজাহান বোধহয় তার অবস্থা বুঝতে পারে। সে বাদলের হাত চেপে ধরে তাকে এগিয়ে নিতে থাকে।

বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অপরিহার্য নাম জাকির তালুকদার। ব্যাপক প্রস্তুতি এবং শক্তিশালী কলম নিয়ে বাংলাসাহিত্যের জগতে আবির্ভাব তার। এখন তার শক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন দেশের সকল পাঠক-সমালোচক, অগ্রজ-অনুজ লেখক। চমক সৃষ্টির বিরোধী হলেও জাকির তালুকদারের প্রতিটি রচনাই প্রকাশলগ্নে চমক সৃষ্টি করেছে চিন্তা এবং আঙ্গিকের অবকাঠামোর ভিন্নতার জন্য।

এই ক্ষীণতণু অথচ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসটি সচেতন পাঠকের জন্য তার নতুন উপহার।

ISBN 978 984 414 434 7

উৎসর্গ

কথাসাহিত্যিক
মঈনুল আহসান সাবের
শ্রদ্ধাভাজনেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিখাদ আতঙ্কের মুখোশ পরা প্রত্যুষ এবাড়ির কেউ আগে কোনোদিন দেখেনি। জ্যৈষ্টমাসের খাড়া দুপুরের আকাশ-পোড়ানো মাটি-পোড়ানো গা-পোড়ানো গরমের সাথে নিম্নচাপ হবে-হবে গুমোট যোগ হলে যেমন সর্বাত্মক শারীরিক-মানসিক অস্বস্তি তৈরি হয়, বাড়ি জুড়ে সেই রকমই দমচাপা আবহাওয়া। আতঙ্ক এমনই সর্বগ্রাসী যে, এমনকি এই ভোরে নামাজ-ঘরের টিনে তার স্বরে কাক ডেকে উঠলে, বেড়ার পাশে কিংবা ঘরের দরজায় নেড়িকুত্তার দল খেউ খেউ করে উঠলেও 'দূর হ' বলার মতো ইচ্ছা অথবা সাহসটুকুও কারো হয় না।

বাড়ির মানুষ সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। অল্প বয়স যাদের, তারাও তন্দ্রার মধ্যে চমকে চমকে উঠেছে দরজায় কড়া নাড়ার কাল্পনিক শব্দ শুনে শুনে। কাল রাতে বাড়ি থেকে যাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে নিশ্চিত ফিরে আসবেই এমন বিশ্বাসে কারো কারো চিড় ধরে গেলেও সে কথা কেউ উচ্চারণ করছে না। মনের অনেক ভেতরের অচেনা এক কোণে এখনো কিছুটা প্রত্যাশা জায়গা করে রেখেছে। কার ওপর ভর করে এমন প্রায় অসম্ভব প্রত্যাশা বেঁচে থাকে? দৈবের ওপর। অলৌকিকের ওপর। আমাদের সময়কালে কেউ কোনোদিন অলৌকিক কিছু ঘটতে দেখিনি নিজেদের জীবনে। কিংবা অন্য কারো জীবনে। তবু আমরা কোনো কোনো সময় অলৌকিক কিছু ঘটার প্রত্যাশা নিয়েই জীবনের ধুকপুকানিটাকে বৈধতা দানের চেষ্টা করি। কিন্তু এই ঘটনাতে অলৌকিকের কোনো হস্তক্ষেপ ঘটবে, এমনটি আশা করাও একটু বেশি আশা হয়ে যায়। কারণ যারা তাকে তুলে নিয়ে গেছে, তারা এতই শক্তিশালী যে অলৌকিককেও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। তা জেনে এবং মেনেও এই বাড়ির মানুষরা অলৌকিকের ওপরেই ভরসা রাখে।

এতক্ষণ কোনো বাতাস ছিল না। এ-ও এক অনিয়ম। সারারাত যতই তাপের দাহ সইতে হোক না কেন পৃথিবীকে, ভোরের দিকে একটু ঝিরিঝিরি আসবেই। কিন্তু আজ সেটাও কেন নেই? এই কথাটা কেউ কেউ বোধহয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেবেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, তাদের চমকে দিয়ে গেটের পাশে কোনো রকমে খাড়া হয়ে থাকা বাঁজা নারকেল গাছটা একবার নিজের শ্রীহীন পাতাগুলিকে এপাশ-ওপাশ দুলিয়ে নেয়। যে খেয়াল করেছে পাতা দোলানো, সে মনে মনে শিউরে ওঠে। এ তো স্পষ্ট 'না' চিহ্ন! মাথা এপাশ-ওপাশ নেড়ে 'না বাচক' ইঙ্গিত করার মতো দুলল কেন নারকোল-পাতা? এ কি তাদের অলৌকিকের প্রতি আশা বজায় রাখার ক্ষেত্রে 'না'? না কি একেবারেই জানিয়ে দেওয়া যে, যাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে আর ফিরে আসবে না।

কিন্তু একটা বাড়িতে কবরের নিস্তব্ধতা থাকলেই যে সাড়া পৃথিবী তার সাথে স্তব্ধতা নিয়ে সংহতি জ্ঞাপন করবে, এমন আশা করা অন্যায়। কারণ পৃথিবী বেশিক্ষণ শব্দহীন থাকতে জানে না। তাই ভোরের নামাজ শেষ হওয়ার আগেই পাশের দুই বাড়ির রেলিং থেকে দুই মহিলার কথোপকথন ভেসে ওঠে। একজন আরেকজনকে ডেকে বলছে– ও ভাবি কী করেন?

কী আর করব ভাবি! যা যা করতে হয় আমাদের রোজ, সেইগুলানই করি। আপনাকেও তো একই রকম কাজ করতে হয়। তাই আপনাকে আর কী বলব!

তাই। ঠিকই বলেছেন। জীবনটা এক চাকাতে বাঁধা হয়ে গেল।

আর জীবন!

এই শব্দযুগলের সাথে প্রায় সমান প্রাবল্যে দীর্ঘনিশ্বাস আছড়ে পড়ে ভোরের গুমোটে। তখন বোঝা যায় যে দীর্ঘনিশ্বাস আসলে অন্যকে শোনানোর জন্যই মানুষ উৎপাদন করে থাকে।

সেই দীর্ঘনিশ্বাসের সাথে সম্মতিজ্ঞাপক আরেক নাতিদীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। কী যে চাইলাম, আর কী যে হলো জীবনটা!

কিন্তু জীবনটাকে তো আর পুরাপুরি পাল্টানো এখন যাবে না ভাবি!

ঠিক।

আবার তাই বলে একেবারে যে পাল্টানো যাবে না তা-ও না।

সে আবার কী? বুঝলাম না তো!

মানে আমরা চাইলে জীবনটাতে কিছু নতুনত্ব, মানে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারি।

আগের মতোই কিছুটা বিমূঢ় প্রতিক্রিয়া আসে– বুঝলাম না তো!

মানে নতুন কিছু করতে পারি। যেমন ধরেন, আমরা ইংরেজিতে কথা বলা অভ্যাস করতে পারি।

ইংরেজিতে কথা বলা! কী হবে ওটা করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী হবে মানে? কী হবে না সেটা বলেন? ইংরেজিতে কথা বলা শিখলে সব হবে। সবকিছু হবে। দাঁড়ান দেখাচ্ছি।

ঘরের ভেতর লঘুপায়ে ছুটে যায় এক রেলিংয়ের ভাবি। ফিরে আসে সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকের চাররঙা ঝকমকে একটা পাতা নিয়ে। তারপর বিপরীত রেলিংয়ের দিকে একবার দুলিয়ে নিয়ে বলে– এই দ্যাখেন এই পত্রিকার মাধ্যমে বিবিসি জানালা কেটে দিয়েছে আমাদের জীবনে। সেই জানালা দিয়ে ইংরেজি আসবে। পাল্টে যাবে আমাদের জীবন।

কীভাবে?

আরে ইংরেজিতে কথা বলতে পারলে সারা দুনিয়ার মানুষ সমীহের চোখে তাকায়। তা সারা দুনিয়া আমাদের দরকার নাই। ঘরের মানুষ অন্তত তাকাবে তো।

ফিক করে হাসির শব্দ হয়। তারপরেই উচ্চারিত হয়– ইংরেজি শুনলে স্বামী-শাশুড়ি সম্মান দেবে!

দেবে। দিতেই হবে! দ্যাখেন না কোনো লোক ইংরেজি বললেই সমাজে তার আসন উঁচুতে উঠে যায়।

সমাজ আর বাড়ি কি এক হলো?

অবশ্যই। আমার খালাতো বোনের কাছে শুনেছি, ইংরেজি শেখার পরে তার প্রতি স্বামীর ভালোবাসা বেড়ে গেছে। ইংরেজি শব্দ একটু জোরে বললে তার খাণ্ডারনি শাশুড়ি পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে তাকায়।

ইংরেজির এত গুণ!

হ্যাঁ। ইংরেজি হচ্ছে এ যুগের আলাদ্দিনের চেরাগ। এটা দিয়ে আপনি যা খুশি করতে পারবেন। বুঝতে পেরেছেন?

বুঝলাম।

তাহলে আসেন শুরু করি।

আচ্ছা শুরু করা যাবে একদিন।

একদিন মানে! এখনই শুরু করতে হবে। এক্ষুনি আমরা শুরু করব।

কীভাবে?

এই পত্রিকাতে সব লেখা আছে। যে কোনো এক জায়গা থেকে শুরু করলেই হলো। এই যে আমি শুরু করছি। আজকে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব যে সকালে আপনি কী নাস্তা বানাবেন। আমি জিজ্ঞেস করছি– হোয়াট স্যাল ইউ কুক দিস মরনিং ফর ব্রেকফাস্ট?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই রুটি বানাব, সবজি রাঁধব, ডিম ভাজব।

না না এভাবে বললে হবে না। বাংলায় বললে হবে না। ইংরেজিতে বলতে হবে। আর রুটি, সবজি, ডিমভাজির কথা বলা যাবে না। বিবিসি জানালাতে যা যা বলা আছে ঠিক সেগুলোর কথাই বলতে হবে। এখানে বলা আছে– স্যুপ, কর্নফ্লেকস, মিল্কশেক, আর লো-ক্যালরি বিস্কিটের কথা। আপনাকে বলতে হবে– আই শ্যাল।

অপর রেলিং থেকে প্রতিধ্বনি আসছে না দেখে একটু মিষ্টি ধমক বেজে ওঠে এই রেলিং থেকে– বলছেন না কেন? বলেন– আই শ্যাল

আই শ্যাল...

এই বাড়ির মানুষ সারারাত স্বজন হারানোর উৎকণ্ঠা সহ্য করেছে, এতক্ষণ কাকের কা কা সহ্য করেছে, কুকুরের ঘেউ ঘেউ সহ্য করেছে, নিজেদের মধ্যেকার অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার অত্যাচার সহ্য করেছে, এখন বসে বসে তাদেরকে নাকিসুরের হাইপিচ কণ্ঠের বিবিসি জানালা সহ্য করে যেতে হয়। কিন্তু কতক্ষণ আর মানুষ পারে! বাড়ির বড় পুত্রসন্তান, আজ যে অনুজের নিখোঁজ হওয়ার কারণে অফিস কামাই দিচ্ছে, অবশেষে যাকে অন্যান্য অত্যাচারের সাথে ভুল ইংরেজিতে কথোপকথনের অত্যাচারও সহ্য করতে হয়, সে বিড়বিড় করে বলে– ব্রিটিশরা দুইশো বছর ইংরেজি শিখিয়ে বিদায় নিছে। এখন তাদের বিছনরা শিখাচ্ছে ইংরেজি! শালার দেউলিয়া জাতির গুষ্টি মারি...

খিস্তি শেষ করে না সে। মনে পড়ে পাশেই বসে আছে তার মা। অবিরল মুখ থেকে তার বেরিয়ে আসছে নিঃশব্দ দোয়া-কালাম। চোখের সজলতা যার একমুহূর্তের জন্যেও শুকনো হয়নি অথচ বাড়ির অন্যদের ওপর মারাত্মক সংক্রামক প্রভাব পড়বে জেনে যিনি নিজেকে একবারের জন্যেও কান্নাতে ফেটে পড়তে দেননি। এর মধ্যেও বাড়ির দুই ছেলের বউকে তিনি পাঠিয়েছেন রান্না করতে, বাচ্চাদের ঠিকমতো খাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে। ফল হয়েছে উল্টা। বাড়ির পরিবেশ স্বাভাবিক না হয়ে আরও বেশি থমথমে হয়ে উঠেছে। অজান্তেই কারো কারো মনে হচ্ছে, এ কি একেবারেই হারিয়ে ফেলা মেনে নেওয়ার প্রস্তুতিপর্ব? তাহলে সে কি ফিরবে না?

প্রতিবেশী দুই মহিলা তখনও সদ্য অদ্যই শুরু করা ইংরেজি কথাভ্যাসি অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে তারস্বরে। প্রাথমিক লজ্জা এবং জড়তা তারা কাটিয়ে উঠেছে। বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে লজ্জা কীসের? তার ওপর তারা শিখছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজিতে কথা বলা। এখন তাদের উচ্চারিত শব্দগুলো ঠন ঠন করে বাড়ি খাচ্ছে এবাড়ির দেয়ালগুলোতে।

এমনিতেই এই পাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় পাশাপাশি দুই বাড়ির মধ্যে কোনো প্রাইভেসি নামক জিনিস বেঁচে থাকে না। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ঘনবসতির দেশ বাংলাদেশে এই জিনিসটা মেনে নিয়েছে সবাই। কেউ তেমন অসুবিধা বোধ আর করে না। এ-পাশের বাড়ির কাজের বুয়া একটু চালাক-চতুর কানতোলা হলে মোটামুটি নির্ভুল বলে দিতে পারে ডানের বাড়ি বামের বাড়ির দম্পতি গেল মাসে কয় রাত সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। কোন বাড়িতে কে কে থাকে, কয়দিন অন্তর অন্তর কেমন চেহারার নারী-পুরুষ কোন বাড়িতে আসে, অন্যদের তা মুখস্ত। তাই রাতে যে এবাড়ির সবচেয়ে জোয়ান এবং কর্মক্ষম ছেলেটিকে তুলে নিয়ে গেছে কে বা কারা তা জানতে সবার না হলেও অন্তত কারো কারো বাঁকি নেই। তারপরেও এমন কিছু-হয়নি ভাব ধরে রাত কাটিয়ে দিনকে বরণ করছে কীভাবে পাড়ার মানুষ!

সকালটা আর একটু ফুটে উঠতে খুব মৃদুস্বরে বাড়ির বড় বউ আহ্বান জানায়– নাস্তা দেওয়া হইছে টেবিলে।

তখন, একমাত্র ফজরের নামাজপড়া মা ছাড়া অন্য সকলেরই মনে পড়ে যে আজ এখন পর্যন্ত কারো প্রাতঃকৃত্য সারা হয়নি। বড়ছেলের তো সকালে পানি-চা-সিগারেট না পেলে পেটে মোচড় আসে না। সে তাই উঠে নিজের ঘরের দিকে যায়। চায়ের কাপ এবং পানির গ্লাস হাতে বউ তার এক্ষুনি এসে দাঁড়াবে সামনে। অনেকদিনের রুটিন। কিন্তু আজ কোনোকিছুই আগের মতো ঘটে না। সে চা-পানির জন্য অপেক্ষা না করেই সিগারেট ধরায়। এবং জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে চেপেই বিছানায় একটু গড়িয়ে নেবার জন্য এলিয়ে পড়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটভাইকে খুঁজতে বেরিয়েছে বড়ভাই। কোনদিকে যাবে, কার কাছে যাবে, জানে না। তবু হাঁটতে হাঁটতে শহর চষে ফেলছে সে। পুরো দুইবার চক্কোর মারা হয়ে গেছে তাদের ছোট্ট শহরটাকে। এই শহরে ঢাকার মতো কোনো পুরনো শহর বা ওল্ড টাউন নাই। তবু তার কেন যেন মনে হয়, এই শহরেও একটা ওল্ড টাউন আছে। সে সেখানে যাবে। এবং নিজেই আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করে যে প্রায় আধাঘণ্টার মতো হেঁটে সে ঠিকই ওল্ড টাউনে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু বাড়িঘর-রাস্তা-লোকজন কোনোকিছুই তার চেনা শহরের চিত্রের সাথে মেলে না। এমনকি পুরনো ঢাকার সাথেও মেলে না এই এলাকা। কিন্তু তার কেন যেন মনে হতে থাকে এই এলাকা পুরোটাই তার চেনা। এখানে কোথায় কী আছে সবকিছুই তার জানা। সে কীভাবে জানল এসব? মাথার ভেতরে একবার আবছা উঁকি দিয়ে যায় দুইটি বিশ্ববিখ্যাত নাম। ওরহান পামুক। এবং কার্লোস ফুলেন্তস। তাহলে সে কি তার নিজের শহরে নয়, হেঁটে বেড়াচ্ছে ইস্তাম্বুলের পুরনো এশীয় অংশে, নাকি মেক্সিকো সিটির প্রাচীন দোনসেলেস স্ট্রিট এলাকায়? এই চিন্তার কুহক তাকে অনেকখানি বিভ্রান্ত করলেও সে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে নির্ভার করতে পারে এই বলে যে সে এসেছে তার ভাইয়ের খোঁজে। ভাইকে খুঁজে পেলেই তার চলবে। সে তার নিজের শহরে হোক, পুরনো ঢাকায় হোক, ইস্তাম্বুলের গরীবতর এশীয় অংশে হোক, আর মেক্সিকো সিটির পরিত্যক্ত অংশে হোক। ভাইকে খুঁজে পাওয়া দিয়ে কথা তার! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ভাইকে খুঁজে পাওয়া। আর প্রায় তার সমানই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই এলাকায় জীবনে পা না পড়লেও সে সবকিছু চেনে। অতএব তন্ন তন্ন করে খুঁজতে তার অসুবিধা হবে না।

সে আস্তে-ধীরে শহরের ছাল-বাকলা ওঠা রাস্তা দিয়ে নির্দিষ্ট একটা দিকে এগিয়ে চলে। কেউ তাকে বলে দেয়নি কোন দিকে হাঁটতে হবে। কিন্তু সে নিশ্চিত জানে, তাকে কোন দিকে যেতে হবে। দুইধারের লেদ মেশিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারখানা, পান-সিগারেটের চিপা দোকান, বাসি বিরিয়ানি আর ডালপুরি-চায়ের দোকান, সাইকেল-রিক্সার চাকায় হাওয়া দেওয়ার সিলিন্ডারের পাশ দিয়ে সে হেঁটে চলে। হেঁটে চলে মানুষ, রিক্সা, সাইকেল, হোন্ডা, কখনো কখনো প্রাইভেট কারের সাথে ধাক্কা খাওয়ার উপক্রম করে করে, অথচ একবারও ধাক্কা না খেয়ে। কোথাও না থেমে একবারে এসে দাঁড়ায় উদ্দিষ্ট গলিটার সামনে। যেন নিশ্চিত জানে এই গলির মধ্যেই রয়েছে সেই বাড়িটা। কোনোমতে একজন নিজেকে ঢুকিয়ে দিতে পারে, এমন একটা সরু গলির সামনে সে দাঁড়ানো এখন। সে জানে এই গলির ভেতরে ঢুকলে পাওয়া যাবে একটা টিনের পাত বসানো কাঠের গেট। গলির মধ্যে ঢুকতেই বাইরের উজ্জ্বল আলো হঠাৎ-ই হারিয়ে যায়। সে মাথার ওপরের আকাশের দিকে তাকায়। গলির ওপরটা তো ঢাকা দেওয়া নেই। তাহলে হঠাৎ অন্ধকার এল কোত্থেকে! আকাশের দিকে তাকালে রহস্যটা বোঝা যায়। আকাশকে হঠাৎ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া মোমবাতির মতো লাগছে। অথচ একধাপ পেছনে গলির মাথায় মালখান স্ট্রিট বা দোনসেলেস স্ট্রিটে পা দিলেই আকাশ ধারালো রোদে তলোয়ারের মতো ঝকমকে। তাহলে কি স্ট্রিটের আকাশ আর এই গলির আকাশ আলাদা? স্ট্রিট থেকে গলির মধ্যে পা দেওয়ার মানে কি আরেকটা পৃথিবীর শুরুতে পা দেওয়া? এসব চিন্তা আষাঢ়ের মেঘের মতো তার মাথায় একের পর এক ভর করতে থাকলেও পায়ের প্রতিটি ধাপকে অটলটলায়মান রেখেই গলিপথ হেঁটে টিনের পাত-মোড়ানো পচতে শুরু করা কাঠের গেটের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। দরজা বন্ধ। সে কলিং বেলের খোঁজে একটু এদিক-ওদিক তাকায়। কোনো কলিং বেল নেই। এমনকি দরজাতে কোনো কড়াও নেই যে নাড়বে। সে তখন ডান হাতের তিনটে আঙুলের উল্টাপিঠ দিয়ে কাঠের ওপর টোকা দেয়। ভেজা কাঠ কিংবা কাঠবোর্ডে টোকা দিলে যেমন হয়, সেই রকম ঢব ঢব শব্দ ওঠে। একটু ভয় পায় সে। বোধহয় কাঠ একেবারেই পচে গেছে। জোরে হাতের থাবড়া দিয়ে অওয়াজ করতে গেলে কাঠের গায়ে গর্ত হয়ে হাত ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। কী করবে বুঝতে না পেরে সে দুই হাতের তেলো সমানভাবে কাঠের গায়ে বসিয়ে একটু ধাক্কা দেয়। তখন সবিস্ময়ে খেয়াল করে যে দরজা ভেতর থেকে খুলে দেবার জন্য কোনো ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজনই নেই। কারণ দরজা আসলে খোলা। কেবলমাত্র পাল্লাদুটো পরস্পরের গায়ে ভেড়ানো।

পাল্লা ঠেলে সে বাড়ির ভেতরে পা রাখে। অন্ধকার এখানে তত প্রবল নয়। অন্ধকারের সাথে কিছুটা আলো মেশানো রয়েছে। ফলে অন্ধকারের অস্বস্তি তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেটে যেতে থাকে। কিন্তু স্যাঁতসেতে একটা অনুভূতি তাকে জড়িয়ে ধরতে শুরু করে। ঘাড়ের পেছনে এবং মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ যেন। মনে হচ্ছে সূর্যের আলো ক্বচিৎ-কদাচিৎ ঢুকতে পারে এমন একটা পাহাড়ের গুহায় শ্যাওলা মাখা মেঝেতে বসে আছে সে। জোরে হাঁটলে উষ্ণতা বাড়বে মনে করে সে দ্রুত পা চালায়। অনভ্যাসের কারণে অচিরেই বিনবিনে ঘাম ফুটে ওঠে বগলে জামার তলায়, সেইসঙ্গে শ্বাসলয় বেড়ে যায় দ্বিগুণের বেশি। ফলে এতই দ্রুত সে আলো-অন্ধকার মেশানো জায়গাটুকু পেরিয়ে একটা টানেলের মতো বারান্দার সামনে পৌঁছে যায় যে নিজেও হকচকিয়ে ওঠে। এখানে অন্ধকার অনেক ঘন। অথচ সিলিংয়ে ন্যাড়া একটা ষাট-চল্লিশ ওয়াটের বাতি ঝুলছে। কিন্তু এত পোকা সেটিকে নিশ্ছিদ্রভাবে ঘিরে রয়েছে যে একবিন্দু আলোও বাইরে আসতে পারছে না। এই সময় সে বিকল্প আলোর সন্ধান করে মনে মনে। তখনই মনে পড়ে যে তার পকেটে মোবাইল ফোন রয়েছে। সেটিকে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যেতে পারে আলোর উৎস হিসাবে। পকেটে হাত দিয়ে মোবাইল বের করামাত্র সেটি বেজে ওঠে তাকে ঈষৎ চমকে দিয়ে। কানে তুলতে ভেসে আসে একটি ক্লান্ত নারীকণ্ঠ– কোনো দরকার নেই মোবাইলের টর্চ জ্বালানোর। আপনি পৌঁছে গেছেন প্রায়। সোজা হাঁটুন সামনের দিকে। বাইশ পা হাঁটার পরে ডান দিকে ঘুরবেন। সিঁড়ি উঠে এসেছে। মোট তেরো ধাপ। সিঁড়ি দিয়ে উঠে নাক বরাবর যে দরজাটা আছে, সেটা খুলতে পারলেই আপনার আকাঙ্ক্ষা পুরণ হবে। কিন্তু সাবধান, শব্দ করলেই পাহারাদাররা...

কথা শেষ না করেই মোবাইল স্তব্ধ হয়ে যায়। সে চাপাস্বরে বারদুয়েক হ্যালো হ্যালো করে। কেটে দেওয়া নম্বরে রিং করার জন্যে সে কল-লিস্টে ঢোকে। কিন্তু অবাক হয়ে খেয়াল করে সেখানে কোনো নম্বর নেই। সে কিছুটা বিমূঢ় হয়েই মোবাইল পকেটে রেখে দেয়। তারপর একটু আগে শোনা নির্দেশমতো পা চালায়।

বলা হয়েছে শব্দ করা যাবে না। তাই সাবধানতার আতিশয্যে তার নিজের পায়ের সামান্যতম ঘষটানির শব্দও তার কাছে গির্জার ঘণ্টার মতো ঝনঝন করে বাজে। আর প্রতিবার নিজের পায়ের মৃদুতম শব্দ শোনার সাথে সাথেই সে ভয়ে কুঁকড়ে যায়। নিজের জন্য নয়, ছোটভাইয়ের জন্য ভয়। যদি এতদূর এসেও তাকে পাওয়া না যায়!

পায়ের কাছ দিয়ে নিঃশব্দ বিদ্যুতের মতো কিছু একটা ছুটে যায়। সে আঁতকে উঠে এদিক-ওদিক তাকায়। দুটি জ্বলজ্বলে গোল আগুনে-আলো দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। সে ভয় পাওয়ার আগেই চিনে ফেলে সেটাকে। বিড়ালের চোখ। এই বাড়িতে কি অনেক ইঁদুর আছে? তা নাহলে বিড়াল কেন থাকবে এখানে? আর ইঁদুর থাকা মানে তো ভয়ানক ব্যাপার। পুরোপুরি পরিত্যক্ত কোনো জায়গাতে ইঁদুর থাকে না। যেখানে তাদের নিয়মিত খাদ্যসংস্থান হয়, কেবল সেখানেই তারা থাকে। আর মানুষের শবদেহের চাইতে উপাদেয় খাদ্য তাদের কী হতে পারে! ভয়ের শীতল স্রোত তার মেরুদণ্ড বেয়ে নামতে থাকে। আর সেই ভয়ের কারণেই সে ভুলে যায় কয়ধাপ হাঁটা হয়েছে ইতোমধ্যে। কী হবে তাহলে এখন?

একবার পেছন দিকে তাকায় সে। ঠিক কোন জায়গাটি থেকে তাকে বাইশ ধাপ গুনে হাঁটতে বলা হয়েছিল সেই স্থানবিন্দুটি ঠাহর করতে পারে না কিছুতেই। তখন তার ঘাম আরও বিপুল বেগে জামা-গেঞ্জি ভেজাতে থাকে। সে তখন মড়িয়া হয়ে পা বাড়ায়। একবার ইচ্ছা করে মোবাইলের টর্চ জ্বেলে সিঁড়িটা খুঁজে নেয়। কিন্তু সাবধানবাণীর কথাও মনে পড়ে। চরম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে আলো জ্বাললে।

কিন্তু সর্বনাশ ঘটেই যায়। তার পায়ের নিচে চাপা পড়া একটা ধেড়ে লোমশ শরীর এত জোরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ওঠে যে মনে হয় বাড়ির মধ্যে লুকানো অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। সে পা উঁচু করতেই ইঁদুরটা ছুটে পালায়। কিন্তু দুড়দাড় পায়ের শব্দ আসতে থাকে দোতলা থেকে, নিচতলার ডানপাশ থেকে, বামপাশ থেকে। এদিক-ওদিক অন্ধকার ফুঁড়ে জ্বলে উঠতে থাকে ছয় ব্যাটারির জোরালো টর্চের আলো। সেই আলো এবং তাড়া করে আসা শব্দের মধ্যে সে জনারণ্যে হঠাৎ ন্যাংটো হয়ে পড়া বিমূঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চল্টা-ওঠা সিমেন্টের মেঝেতে দুই পা গেঁথে। কেউ একজন এসে পড়েছে একেবারে কাছে। এক মুহূর্ত পরেই বোঝা যায়, একজন নয়, একাধিক জন। একাধিক দিক থেকে। সে তাই কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সবচেয়ে কাছে এসে পড়েছে পেছনের একজন। পিঠের ওপর বিশাল এক থাবড়া এসে পড়ে। সে হুমড়ি খেয়ে পড়া থেকে বাঁচার জন্য বাতাসে দুই হাত এলোমেলো আছড়ায়, পড়বে না প্রতিজ্ঞা করেও দুইপায়ের ওপর টলমল করে। এবার জোরে কেউ পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। খুব জোরের ধাক্কা। তাকে তখন লুটিয়ে পড়তেই হয় মেঝেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির মধ্যে তখন অসন্তোষের গুঞ্জন উঠে গেছে। বাড়ির বড় ছেলে হয়ে এই রকম সময়ে একজন ঘুমিয়ে পড়ে কোন আক্কেলে? স্ত্রী-র ধাক্কাধাক্কিতে জেগে উঠেই এই অসন্তোষের গুঞ্জনের মুখোমুখি হতে হয় তাকে। সমস্ত মন বেয়ে প্রতিবাদের শব্দ উঠে আসতে চাইলেও সেটাকে চিরকালের মতো গিলে ফেলে সে আবার সকলের সঙ্গে মিলিত হয় বসার ঘরে। তাদের বড় খালু এসেছেন। রিটায়ার করার পরে এই শহরে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নিয়ে বেড়ানোই তার প্রধান কাজ। তিনি প্রায় ধমকের সুরে সবাইকে বলছেন– কাল রাত নয়টার সময় ঘটনা ঘটেছে, নয়টার সময় তুলে নিয়ে গেছে ছেলেটাকে, অথচ এখনো থানায় কোনো খবর দেওয়া হয়নি! এটা একটা কথা হলো?

কে তাকে বোঝাবে যে যারা এবাড়ির ছোট ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গেছে, তারা নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল আইনের লোক বলেই। সেই কারণেই থানায় যাওয়া হয়নি। কারণ আইনের লোক যখন তাকে নিয়ে গেছে, তখন কোনো খবর এলে থানা থেকে ঠিকই আসবে।

এমন কথায় কপাল চাপড়ান বড় খালু– হায় হায়, তোমরা সেই কথা বিশ্বাস করে বসে আছো! পেপার-পত্রিকা-টেলিভিশনে তো রোজ রোজ খবর থাকে যে ভুয়া পুলিশ, ভুয়া আইনের লোক সেজে দুষ্কৃতীকারীরা অহরহ লোককে ঠকাচ্ছে। ওদের পরনে কি পুলিশ বা সরকারি বাহিনীর পোশাক ছিল?

না। সিভিল ড্রেস।

তাহলেই বোঝো। কোনো ওয়ারেন্ট দেখিয়েছে ওরা?

না।

নিজেদের পরিচয় হিসাবে আইডি কার্ড দেখিয়েছে?

না।

তোমরা কেউ দেখতে চাওনি?

আইডি কার্ড দেখতে চাওয়ার সাহস তখন কার থাকে? তবে তারা তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয় জানতে চেয়েছে বারবার। জানতে চেয়েছে তারা কোন বাহিনীর লোক। অনুনয়ের সঙ্গে জানতে চেয়েছে ছেলেকে কোন অপরাধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আকুল হয়ে জানতে চেয়েছে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ঘটনার পুরো বিবরণ শুনতে চান খালু।

পুরো বিবরণ মানে কোত্থেকে ঘটনার সূত্রপাত, কীভাবে এই নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাটা জাগ্রত হলো একটা দলের মনে, সেকথা তো তাদের কারো জানা নেই।

আহা সেটা নয়। তোমার যেটুকু দেখেছ, সেটুকুই বলতে বলছি।

তখন বলতে হয়। রাত নয়টার দিকেই হবে। সাধারণত এত অল্প রাতে বাড়িতে ফেরে না কোনো ছেলেই। সাড়ে দশটা বা এগারোটা বেজে যাওয়া তো নিয়মিত ঘটনা। কোনো কোনো রাতে বারোটাও বেজে যায়। এ নিয়ে অনেকদিন-মাস-বছর কথা চালাচালির পরে কেউ আর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করে না। রাতে যে যার মতো কাজ সেরে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে বাড়ির মানুষ। ছেলেদের ভাত ঢাকা থাকে ডাইনিং টেবিলে। যে যার মতো খেয়ে নেয়। কিন্তু কাল রাতে ছোট ছেলে ফিরেছে আগে আগে। আটটার পরপরই।

তাকে কি উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল?

না। অন্য দিনের মতোই স্বাভাবিক।

তাহলে যে আগে আগে ফিরল, অস্বাভাবিক মনে হয়নি?

না। কারণ সে এসেই টিভির সামনে বসেছিল। তখন মনে হয়েছিল বাংলাদেশ-ইন্ডিয়ার টি-টুয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচ দেখার জন্যই তাড়াতাড়ি ফিরেছে সে। এমনটি আগেও হয়েছে। চা-চানাচুর সামনে নিয়ে জম্পেস করে বসে খেলা দেখার অভ্যেস ছেলের। সেই খেলা দেখতে দেখতেই মোবাইল ফোন। অন্য কথা বোঝা যায়নি। তবে 'আসছি' শব্দটা কানে গেছে পাশের ঘরে জায়নামাজে এশার নামাজরত মায়ের। পরনে ঘরে পরার ট্রাউজার আর টি শার্ট। চটি পড়েই বাইরে বেরিয়ে গেছে মোবাইল হাতে। বাইরে মানে দূরে নয়। একেবারে ঘরের দরজাতেই বলা যায়। মানে গ্রিলের গেটের বাইরেই। সেখান থেকেই মোবাইলে বউকে বলেছে নিচে আসতে। কণ্ঠস্বরে এমন ভীতি ছিল যে তার বউ সঙ্গে সঙ্গে মাকে জায়নামাজ থেকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। একটা মাইক্রো দাঁড়ানো। স্টার্ট দেওয়াই রয়েছে। মানে ড্রাইভার গাড়িতেই ছিল। চারজন দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ছেলেকে ঘিরে। তিনজনের পরনে জিনস আর টি শার্ট। একজনের পরনের প্যান্টের মধ্যে গোঁজা চেকশার্ট। জোয়ান সবাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুল ছোট করে ছাঁটা পুলিশের মতো। আলোটা তেমন উজ্জ্বল নয় বলে কারো মুখই স্পষ্ট দেখা যায়নি। মা গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে কী হয়েছে। তারা বিরক্ত হতে গিয়েও সম্ভবত নামাজ থেকে উঠে আসা মায়ের অবয়বের মধ্যে এক ধরনের সৌম্যতা দেখে নিজেদের বিরক্তি গোপন করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলেছে যে ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। শহরে কিছু ঘটনা ঘটেছে। সেসব নিয়ে কথা বলার জন্য তারা তার ছেলে খালেদুর রহমানকে নিয়ে যাচ্ছে। আধাঘন্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। তারা ছেড়ে দেবে খালেদকে। শহরে কী ঘটনা ঘটেছে, আর সেসবের সাথে খালেদের সম্পর্ক কোথায়, এমন প্রশ্নে তারা আর বিরক্তি চেপে না রেখে বলেছে যে সেসব ব্যাখ্যা করার সময় তাদের হাতে নেই। ওসব তারা পরে শুনে নিতে পারবেন ছেলের কাছ থেকে। তারা এখন রওনা দিতে চায় খালেদকে নিয়ে। সেই অবস্থাতেও মরিয়া হয়ে মা– তারা কারা– এই প্রশ্ন করায় শুধু দুইটা শব্দ বলেছে– আইনের লোক। তখন খালেদ কাপড় পাল্টানোর কথা বলতে ওদের একজন রসিকতা না শ্লেষ কোনটা মিশিয়ে যে বলল– শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছেন না সাহেব। এই ড্রেসেই চলবে। ড্রেস পাল্টানোর নামে দেরি করার কোনো দরকার নেই। খালেদ ভয় পেয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। দেরি করতে চাইছিল। এদিক-ওদিক চঞ্চল চোখে তাকাচ্ছিল বারবার। কিন্তু তখন একে ক্রিকেট, তার ওপর ইন্ডিয়ান চ্যানেলে তুমুল বউ-ঝি টানা সিরিয়ালের উত্তুঙ্গ সময়। বাইরে লোকজন নেই। পাড়ার মুদি দোকানে বা চায়ের দোকানে যারা থাকে, তারাও টেলিভিশনের সামনে গিয়ে বসেছে। কাজেই এমন কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না, যাকে পেলে এই ঘটনাটাকে বিলম্বিত করা সম্ভব। এত গায়ে-গা-লাগা মানুষের দেশে এমন নিঃশব্দে একটা মানুষকে, অর্থাৎ তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে, ঘটনা-শোঁকার আগ্রহে আকুল বাঙালির দেশে প্রায় নির্জন এমন একটা প্রহর তার সামনে এসে উপস্থিত হবে, এটা বিশ্বাসই হতে চাইছিল না খালেদের। এই তো সবগুলো বাড়ির জানালা দিয়েই টেলিভিশনের শব্দ ভেসে আসছে। বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যান চার-ছয় মারলে তো কথাই নেই, এক-দুই নিলেও উল্লাসের তোড় বেরিয়ে আসছে বাড়িগুলোর দুর্বল দেয়াল ফুঁড়ে, সেইসব শব্দে পুরোটা ঢাকা পড়ে আছে শক্তিশালী মাইক্রোর শক্তিধর ইঞ্জিনের চাপা আওয়াজ। তারপর আর কথা হয়নি কোনো। খালেদকে জোর করে গাড়িতে ওঠায়নি তারা, কারণ খালেদ কোনো ধস্তাধস্তি করেনি, বা না যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করেনি। গাড়িটা চলে যাওয়ার সময় এগজস্ট পাইপ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেটুকু ধোঁয়া বের হওয়ার কথা, তার চাইতে অনেক কম ধোঁয়া প্রায় না-বওয়া বাতাসের সাথে মিলিয়ে দিয়ে দিয়ে চলে যায়।

বর্ণনা শুনে খালু কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকেন। যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ঘরের মানুষদের চোখ অজানা আশায় একটু উজ্জ্বলও হয়ে ওঠে তার চিন্তার গভীরতা দেখে। এমন সমাহিত ভঙ্গিতে চোখ বন্ধ করে তিনি চিন্তায় ডুবে গেছেন যে চিন্তার গভীরতা যেন ধ্যানের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এই রকম ভঙ্গি সামনের লোকদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। বিশেষ করে আজকের পরিস্থিতিতে, যখন খড়কুটো যা-ই পাওয়া যাক, তা আঁকড়ে ধরতে পারলে বেঁচে থাকার জ্বালানির জোগান পাবে এই বাড়ির মানুষ। তাই অনেকক্ষণ ধরে চোখ বুঁজে থাকলেও কেউ-ই খালুর ওপর বিরক্ত হয় না। বরং তার ধ্যান-পর্যায়ের চিন্তায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, তাই কথা বলা বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে ইশারায় কাজ চালিয়ে নিতে থাকে সবাই। তার সামনে রাখা কাপের সুগন্ধি চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে এমন কথাও কেউ মনে করিয়ে দেয় না পর্যন্ত। চা ঠাণ্ডা হলে আরেক কাপ বানিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু চিন্তার মধ্য দিয়ে যদি কোনো সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসে, তাহলে তাকে ব্যাহত করা মানে নিজেদের পায়ে আরেকবার কুড়াল মারা।

বেশ অনেকটা সময় পরে চোখ খুলে খালু নির্দ্বিধ কণ্ঠে ঘোষণা করেন– ওরা আইনের লোক ছিল না।

খালুর মুখ থেকে এমন কথা শুনতে কেউ প্রস্তুত ছিল না। তারা চেয়েছিল আশ্বাসের বাণী। খালেদকে তুলে নিয়ে যাওয়া লোকেরা আইনে না কি আউট-ল তা জেনে লাভটা কী?

বোধহয় তাদের মনের কথা বুঝতে পেরেই খালু নিজেও একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। বলেন– না, তোমরা চিন্তা করে দ্যাখো, ওরা আইনের লোক হতেই পারে না। কারণ আইনের লোক হলে, কেউ দেখতে চাক আর না চাক, চোখের সামনে ডান্ডি কার্ড একবার ঝুলিয়ে দেখানোর অভ্যেস থাকে। মানে কোনো কোনো মানুষের কাছে নিজের চাইতে নিজের আইডেন্টিটি কার্ডের দাম বেশি।

খালুর মুখে এই কথাটি শুনে চমৎকৃত হয়ে যায় বড় ছেলে বাদল। খালুকে স্থূলবুদ্ধির সংসারসর্বস্ব মানুষ বলেই বিবেচনা করে সে। সেই লোকেরও যে এমন একটা পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে, এমন কথা ভাবাই যায় না। সে এই প্রথম একটু সম্ভ্রম নিয়ে তাকায় খালুর দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালু ততক্ষণে আবার নিজের ট্র্যাকে ফিরে গেছেন– তাছাড়া আইনের লোক আসবে কেন বলো? খালেদ কি বিরোধী দল করে?

নাহ। কোনো রাজনৈতিক দলই করে না। তার কোনো কোনো বন্ধু বরং সরকারি দলেরই বিভিন্ন গ্রুপের সাথে জড়িত।

তাহলেই বোঝো। সে এমনকি সরকারি দলের সাথেও নেই।

না নেই।

সরকারি দলের সাথে থাকলে তো কোনো ঝামেলাই হতো না। তবে কথাটা তা নয়। কথাটা হচ্ছে সে বিরোধী দলের লোক নয়। নেতা নয়, পাতি নেতা নয়, কর্মী নয়, এমনকি হাতা-নাতাও নয়।

না।

তাহলে তো মিটেই গেল।

মানে?

মানে নিশ্চিত হওয়া গেল যে তাকে পুলিশ, মানে আইনের লোকেরা ধরে নিয়ে যায়নি। আর ক্রসফায়ারের তো কথাই আসে না।

ক্রসফায়ার!

শব্দটা শোনার সাথে সাথে এই জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম সকালেও প্রত্যেকের মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত নেমে যায়। ক্রসফায়ার মানে তো মৃত্যু। এতক্ষণ তারা তাদের বাড়ির ছোট ছেলেটিকে কে ধরে নিয়ে গেছে, সে কখন ফিরবে– এসব চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু সে যে মৃত্যুর মুখে চলে যেতে পারে এমনটি ভাবেনি কেউ। খালুর মুখ থেকে ক্রসফায়ার শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের দুশ্চিন্তার মাঝে নতুন যে আতঙ্কের ব্যঞ্জনা যোগ হয়, তার ধাক্কা সামলাতে গিয়ে কেউই অনেকক্ষণ ধরে কোনো শব্দই উচ্চারণ করতে পারে না। বাদলের মনে আরো অনেক বেশি তথ্য হাঁচোরপাঁচোর করে। খালু জানেন না, অথবা জানলেও ভুলে গেছেন, ক্রসফায়ারে সরকারি দলের লোককেও মারা হয়। এই মফস্বল শহরেই মারা হয়েছে।

খালু সশব্দে চুমুক দিয়ে চা শেষ করে বাদলের দিকে তাকিয়ে বলেন– চলো!

কোথায়?

থানায়।

থানায়?

হ্যাঁ থানায়। খবরটা তো দিতে হবে। একটা জিডি অন্তত করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ব্যাপারটা মেনে নেয় সে। তৈরি হওয়ার জন্য নিজের ঘরের দিকে এগোয়।

মা বলে ওঠে– আমিও যাব।

আরে বুনডি তোমার যাওয়ার কী দরকার! আমি বাদলকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই হবে।

আমি যাব!

মা এমনভাবে নিজের ইচ্ছার পুনরাবৃত্তি করে যে কেউ তাকে নিরস্ত করার মতো কোনো শব্দ উচ্চারণের সাহস পায় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফটক পেরিয়ে থানার কম্পাউন্ডে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাদলের মনে পড়ে যে সে এই শহরের সব জায়গাতে গেলেও এর আগে কোনোদিন থানাতে আসেনি। সে তাই স্কুলছাত্রের মতো নতুন জায়গায় যাওয়ার কৌতূহল নিয়ে থানা কম্পাউন্ডের সবকিছু দেখার চেষ্টা করতে থাকে চোখ এবং মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। অবাক হয়ে এই কথাটাও খেয়াল করে যে এতদিন নিজের অবচেতনে সে থানা এবং জেলখানাকে একই রকম মনে করে এসেছে। অথচ বাইরে থেকে তো সে দেখেছে যে থানার দেওয়াল জেলখানার মতো অমন আকাশ ঢেকে দেওয়ার মতো উঁচু নয়। এখন সে খেয়াল করে যে থানার দেওয়াল আসলে তার কাঁধ সমান উঁচু হতে পারে বড়জোর। নিজের ধারণার অদ্ভুতত্ব ধরতে পেরে নিজের কাছেই একটু লজ্জা পায় বাদল।

দেখা যায় থানা নামক ভয়মিশ্রিত জায়গাটি নেহায়েত নিরীহ-দর্শন একটা দালান। ফটক থেকে সোজা একটা দশফুটি রাস্তা চলে গেছে দালানের দিকে। দালানের সিঁড়ির মুখে একটা পিকআপ ভ্যান দাঁড়িয়ে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, থানাকে যেমন দূর থেকে সে লোক-জনে গমগম গিজগিজ করা এলাকা ভেবে এসেছে, থানার পরিবেশ আদৌ সে রকম নয়। থানা মানেই পুলিশ থাকা, হাজতি থাকা, তদবিরের লোক থাকা, দালাল থাকা, উকিল-মুহুরি থাকা, লকআপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা কয়েদির আর্তনাদ বাতাসে ভেসে থাকা। কিন্তু তেমন কিছুই নাই। পুলিশ আছে কয়েকজন। তারা কেউ ভীষণদর্শন নয়। গেটে যে সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে বন্দুক হাতে, সে একবার তাদের দিকে তাকিয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। কোনো বাধা তো দেয়ই নি, বরং একবার জিজ্ঞেসও করেনি যে তারা কার কাছে যাবে। তারা রিক্সা থেকে নেমে সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করেছে। তবে কিছুক্ষণ এগিয়ে খালু আবার ফিরে গেছেন সেন্ট্রির কাছে। জিজ্ঞেস করে এসেছেন ওসি সাহেব কোন ঘরে বসেন।

সেন্ট্রির ইশারা করা ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা এখন। রাস্তা শেষ হতেই তিনধাপ সিঁড়ি। তারপরে টানা বারান্দা। ডান দিকে এগিয়ে গেলে শেষ মাথায় থানার ইনচার্জের ঘর। তার আগের ঘরটায় কয়েকটা চেয়ার-টেবিল এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকজন মানুষকে দেখা যায়। তিনজনের দলটাকে ওসির ঘরের দিকে যেতে দেখে তারা একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। তারপর কিছু না বলে নিজের নিজের কাজ করতে থাকে। তারা ওসির ঘরের সামনে গিয়ে দেখে দরজার পাল্লা খোলা। ভেতরে বেশ পরিচ্ছন্ন সাজানো চেয়ার-টেবিল। মাথার ওপরে একটা সিলিং ফ্যান ঘুরছে। কিন্তু কোনো মানুষ নেই। কিছুক্ষণ সেই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তারা অপেক্ষা করে। কিন্তু কাউকে ঘরে ঢুকতে দেখা যায় না। এমনকি কেউ তাদের কোনো প্রশ্নও করে না। তখন কী করা যায় ভঙ্গিতে তিনজন প্রায় গোল একটা সার্কেল তৈরি করে দাঁড়ায় বারান্দায়।

বলুন আমি কী করতে পারি আপনাদের জন্য!

বিশাল ধাক্কা খায় তিনজনই। বিশেষ করে বাদল।

থানার বারান্দায় এমন পরিশীলিত এবং মার্জিত উচ্চারণ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। কোনো মোবাইল ফোনের সেলস সেন্টারের ছেলে-মেয়েরাও তো এমন সুন্দর এবং আন্তরিক উচ্চারণে কথা বলে না!

বাদলের পেছন দিক থেকে এসেছে কথাটা। সে ফিরে তাকায়।

চমৎকার নিভাঁজ পুলিশ-ড্রেস পরা একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে স্মিত হাসি। বড়খালু তড়বড় করে বলেন– আমরা ওসি সাহেবের কাছে এসেছি।

আলতো মাথা নাড়িয়ে যুবক বলে– আসুন।

ওসি সাহেবের ঘরে নিয়ে বসানো হয় তাদের। কিন্তু যুবক বসে না। বাদলের দিকে তাকিয়ে বলে– ওসি সাহেব জরুরি কাজে বাইরে গেছেন। আপনারা কি ততক্ষণ অপেক্ষা করবেন?

মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বাদল– কতক্ষণ লাগবে উনার ফিরতে?

তা তো বলা যায় না। পুলিশের কাজতো বোঝেনই। যে কাজে তিনি বেরিয়েছেন, সেটা শেষ হলো তো দেখা যাবে তাকে দৌড়াতে হচ্ছে আরেক দিকে। তবে ভাগ্য ভালো থাকলে হয়তো আপনাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। ভালো কথা, আপনারা কি চা খাবেন?

পুলিশ চা অফার করছে থানায় আসা অচেনা-অজানা মানুষকে! দেশটা কী ইংল্যান্ড হয়ে গেল! পরক্ষণেই মনে পড়ে, দেশটা বাংলাদেশই আছে। এবং গত রাতে তার ভাইকে তুলে নিয়ে গেছে কয়েকজন লোক নিজেদের আইনের লোক পরিচয় দিয়ে। সে মাথা নাড়ে। না, চা খাব না।

তাহলে বলুন আমি আপনাদের কী খেদমত করতে পারি। না কি ওসি সাহেব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা তিনজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। কী বলবে বুঝতে পারে না। পুলিশ অফিসার নিজেই আবার বলে– কী কাজে এসেছেন তা কি আমাকে বলা যাবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। খালু এবার নিজের কথা খুঁজে পেয়েছেন। বলেন– আমরা এসেছি একটা ডায়েরি করার জন্য।

ডায়েরি!

জিডি আর কী! জেনারেল ডায়েরি।

ওসির রুমে বসে পুলিশ অফিসারকে জিডি-র অ্যাব্রিভিয়েশন শোনান বড়খালু।

মৃদু হাসি ফোটে পুলিশ অফিসারের কণ্ঠে। বলে– কী বিষয়ে?

মা এতক্ষণে কথা বলে– আমার ছেলে নিখোঁজ।

মানে?

বাদল বলে–মানে আমার ছোটভাই। কাল রাত নয়টার দিকে কয়েকজন লোক তুলে নিয়ে গেছে তাকে।

তাহলে তো নিখোঁজ নয়। অপহরণ। মাই গড! এই এলাকাতেও অপহরণ শুরু হয়ে গেছে! কারা করেছে কাজটা বলতে পারেন? মানে কোনো ধারণা আছে অপহরণকারীদের সম্পর্কে?

এবার একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলে বাদল– আমরা তাদের চিনি না। তবে...

বলুন!

অস্বস্তি আরেকটু বেড়েছে বাদলের। বলে– ওরা আমার ভাইকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় বলেছে তারা না কি আইনের লোক।

কাকে বলেছে?

আমার মা আর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ছিল তখন উপস্থিত। তাদেরকে বলেছে।

পুলিশ অফিসার সটান দাঁড়িয়ে গেছে একথা শুনে। মুখে চিন্তার রেখা।

কী নাম আপনার ভাইয়ের?

খালেদ।

কী করেন তিনি?

ব্যবসা করে। রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স পাস করে বিভিন্ন সংস্থায় চাকুরি করেছে কয়েক বছর। এখন বছর চারেক হলো ব্যবসা করছে।

রাজনৈতিক কোনো ইনভলভমেন্ট আছে?

আমাদের জানা মতে, নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশ অফিসার বলে– আপনারা একটু বসুন। আমি আসছি।

তারা তিনজন বসে থাকে চুপচাপ। দেয়ালের রং দেখে, দেয়াল ঘড়ির পাশে একটা টিকটিকির ছুটাছুটি দেখে, ফ্যানের বাতাসে ক্যালেন্ডারের পাতার একবার ফুলে ওঠা আরেকবার চুপসে যাওয়া দেখে, আর বারবার দরজার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কখন আসবে সেই পুলিশ অফিসার।

অবশেষে ফিরে আসে সে। এবার যখন কথা বলে, তাকে আগের মতো মার্জিত মনে হয় না। বলে– আপনারা যদি জিডি করাতে চান তাহলে অপেক্ষা করতে হবে। ওসি সাহেব ফিরলে তার অনুমতি নিয়ে জিডি করাতে পারবেন। ততক্ষণ আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে পাশের ঘরে। আর আমিও থাকতে পারছি না আপনাদের সঙ্গে। আমাকে বেরুতে হবে।

ঐ খোঁজটা কি পাওয়া গেল?

কীসের খোঁজ?

খালেদকে আইনের লোক, মানে পুলিশ ধরে এনেছে কি না?

একটু চিন্তা করে পুলিশ অফিসার। এখন যে কথা বলছে মেপে মেপে। বলে– পুলিশ আনেনি তাকে। এই নামে কোনো লোকের রেকর্ড নেই আমাদের খাতায়। তাছাড়া কালরাতে আমাদের কোনো অপারেশন টিম ঐ এলাকায় যায়নি।

তাহলে!

বললামই তো।

বাদল এবার যোগ করে– আইনের লোক বলতে তো পুলিশ ছাড়া আরও বিভিন্ন বাহিনী আছে।

তার দিকে ত্যারছা চোখে তাকায় অফিসার– তাদের কথা আমি বলতে পারব না। আপনারা বরং ঐ ঘরে মুন্সির কাছে গিয়ে বসুন। আমি বেরুব।

আমাদের জিডি করার ব্যাপারটা?

ওসি সাহেবের পারমিশন লাগবে। মানে মতামত লাগবে। ব্যাপারটা সেনসিটিভ বুঝতেই পারছেন। আমাদের বা আমাদের সহযোগী কোনো সংস্থার নাম ভাঙানো হয়েছে। এখন জিডি করার ব্যাপারে আমার পক্ষে মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।

পুলিশ অফিসার বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছে দেখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বড়খালু। অসহায় পানিতে পড়া গলায় বলে– আমরা এখন তাহলে কী করব অফিসার! আমাদের কোনো কিছু জানার উপায় নাই। আপনাদের সাহায্য না পেলে আমরা যাব কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু ইতস্তত করে অফিসার বাদলের দিকে তাকায়– আপনার মোবাইল নম্বরটা আমাকে দিন। দেখি কী করা যায়। আমি আমাদের সোর্সের মাধ্যমে খোঁজখবরের চেষ্টা করব। কোনো সংবাদ পেলে জানাব আপনাকে।

পুলিশ অফিসার বেরিয়ে গেলে তারা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। একবার সেখানে পেতে রাখা বেঞ্চিতে বসে। একবার মুন্সির ঘরে গিয়ে বসে।

বাদল খেয়াল করে হঠাৎ করেই যেন তাদের ব্যাপারে থানার সবাই একটু যেন বাড়তি অবহেলা দেখানোর চেষ্টা করছে। কেউ তাদের বসতে বলছে না, কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, এমনকি ওসি সাহেব কখন আসতে পারেন এমন নিরীহ প্রশ্ন করলেও তারা বিরক্তি দেখাতে কার্পণ্য করছে না।

সারাটা দিন তারা থানায় অপেক্ষা করে। ওসি সাহেব আসেননি। তাদের জিডি করাও হয়নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবরটা শোনার পরে প্রায় সবাইকেই খানিকটা বিমূঢ় দেখায়।

পত্র-পত্রিকায় এমন খবর পড়ছে তারা প্রায় নিয়মিত। টিভির অনুষ্ঠানেও আসছে এমন কথা। টক শো-ও হচ্ছে। কিন্তু এমনভাবে নিজেদের শহরে একেবারে নিজেদের জীবনে এমন ঘটনা হুমড়ি খেয়ে পড়বে ভাবেনি কেউ।

আজকে আড্ডায় যাওয়ার মতো মানসিকতা ছিল না বাদলের। কিন্তু দুঃসহ চাপ এবং ভার বুকে নিয়ে অসহায়ভাবে সন্ধ্যা কাটানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তার কাছে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যাওয়া হোক আড্ডাতে। সেখানে গেলে অন্তত খালেদের খোঁজ করার কোনো উপায় বেরিয়ে আসতে পারে আলোচনা থেকে।

সেলিমুজ্জামান রীতিমতো হত-বিহ্বল কণ্ঠে বলে– এসব তো শুনেছি হিটলারের আমলে নাৎসিরা করত! গেস্টাপো বাহিনী দিয়ে সারা জার্মানিতে ত্রাস আর ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছিল।

আলতাফ ভাই যোগ করে– ইরানে রেজা শাহের আমলে সাভাক নামের এক গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর কথা শুনেছি। তারা ইচ্ছামতো মানুষকে গুম করে ফেলত।

আর শুনেছি কেজিবি-র কথা। শুনেছি মানে, পত্রিকায় পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি, ডিটেকটিভ বইতে পড়েছি।

আলতাফ এক সময় রুশপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কথার প্রতিউত্তরে সে বলে ওঠে– তোরা তো খালি কেজিবি-র কথা বলিস। জানিস আমেরিকার এফবিআই নিজের দেশে কত গুম-খুন করেছে? পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে কেজিবি-র চাইতে অনেকগুণ বেশি মানুষকে গুম করেছে তারা। আর সিআইএ তো সারা পৃথিবীজুড়েই গুম-খুন চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন।

এখনই হয়তো পরিসংখ্যান দিতে শুরু করত আলতাফ। বাদলের মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তি দেখে থেমে যায়।

সেলিমুজ্জামান স্বগতোক্তির মতো অসহায় কণ্ঠে বলে– এখন এই জিনিস আমাদের দেশে! আমাদের এই ছোট্ট শহরে! আমাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যই এখন এই রকম গুপ্ত বাহিনীর শিকার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রতনলাল চক্রবর্তী সাবধানী মানুষ। বলে– এভাবে বললে তো চলবে না। এটা সরকারি কোনো বাহিনী না-ও হতে পারে। আমরা তো অহরহই দেখছি ভূয়া পুলিশ, ভূয়া ডিবি, ভূয়া র‍্যাব, ভূয়া মেজর, এমনকি ভূয়া মেজর জেনারেলও। হয়তো এমন কোনো গ্রুপই তুলে নিয়ে গেছে খালেদকে!

সায় দিতেই হয়– হতেই পারে!

কিন্তু এখন কী করা যায়?

কিছু একটা তো করতেই হবে!

চল। এমদাদ ভাই উঠে দাঁড়ায়।

কোথায়?

হামিদ উকিলের কাছে যাই।

সরকারি দলের নেতা। জেলা কমিটির সেক্রেটারি। অনেক ক্ষমতা তার। তার কাছে গেলে অন্তত কিছু-না-কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। না হলেও অন্তত পুলিশ বা প্রশাসনকে সে ঝাঁকুনি দিতে পারবে। নড়াচড়া করতে বাধ্য করতে পারবে।

কিন্তু ওখানে গিয়ে কি আমরা কথা বলতে পারব? সেখানে তো সারা দিনরাত লোক গিজগিজ করে। আমরা সুযোগ পাব কথা বলার?

বলতেই হবে। যত লোকই থাকুক, আমাদের কথা বলতেই হবে। এই রকম একটা বিপদ মাথায় নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। চল তো ওঠ!

দেখা গেল সেখানে অনেক লোক থাকলেও হামিদ উকিল ঠিকই নিজের কাছে ডেকে নেয় তাদের। খবরটা শুনে আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করে সে। অন্যসব চেলা-চামুণ্ডারা অন্য উমেদারি নিয়ে কথা তুলতে গেলে খেঁকিয়ে উঠে থামিয়ে দেয় তাদের। পুরো বিবরণ শোনে বাদলের কাছ থেকে। তারপর থানায় বিড়ম্বনার কথা শুনেই রেগে যায় আরো। টেবিলের ওপর পাশাপাশি শুয়ে থাকা তিন মোবাইলের একটা হাতে তুলে নিয়ে ওসিকে লাইন লাগায়। ওদিক থেকে ওসি হয়তো সেলামালেকুম জাতীয় কিছু একটা বলেছে। কিন্তু তার উত্তর না দিয়ে একটা গাল বকে সে। বলে– আপনার থানা কি আপনার বাপের সম্পত্তি? ওখানে কেউ কোনো জিডি করতে গেলেও মানুষকে হয়রানি করেন আপনেরা। ইচ্ছা হলে জিডি করেন, ইচ্ছা না হলে করেন না। পাইছেনডা কী? একজন জলজ্যান্ত যুবক ছেলেকে সন্ধ্যারাতে তুলে নিয়ে গেছে একদল দুষ্কৃতিকারী। চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করা তো দূরের কথা, তার বুড়া মায়েক বসায়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখিছেন থানার বারান্দাত সারাডা দিন। জিডিখান পর্যন্ত নেন নাই। এইসব কামের জন্যে আপনেক আমরা পোস্টিং দিছি নাকি এই থানাত?

ওপার থেকে ওসি সাহেব বোধহয় কিছু একটা বলতে চাইছে, কিন্তু তাকে কথা চালাতে দেয় না হামিদ উকিল। ধমকের সুরেই বলে যেতে থাকে– আপনের আর কী? বলেন, আপনের আর কী? আপনে চাকরি করতে আইছেন, আজ আইছেন কাল চলে যাবেন। কিন্তু আমাদের এই জাগাতই থাকা লাগে। এই জাগাতই রাজনীতি করা লাগে। ভোট করা লাগে। ভোটের কথা নাহয় বাদই দেন, আমাদের এই জাগাতই জনম, এই জাগাতই মরণ, এই জাগাতই যাবতীয় কর্মতৎপরতা। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে যেসব মানুষের সাথে রোজ ধাক্কা খাওয়া লাগে, যারে সাথে আমাদের সবসময় লেনাদেনা, সেইসব মানুষ যদি আমাদের সরকারের জামানায় পুলিশের কাছ থেকে এই রকম ব্যবহার পায়, তাহলে তাদের কাছে আমরা পরবর্তীতে মুখ দেখাব কেমন করে?

একটু থামে হামিদ উকিল। ওপারের কথা শোনে কিছুক্ষণ। তারপর আবার সেই ক্ষিপ্তস্বরেই বলে– আবার কোন দুঃখে থানাত যাবে তারা? আবার তিনঘণ্টা ধরে থানাত বসে বসে জিডি লেখান লাগবে কেন? আমি ফোন করলাম, আমি আপনের নলেজে দিলাম, এইডাই ধরেন জিডি। এখন আপনের অ্যাকশানে যাওয়া লাগবে। কাজ দেখান লাগবে। এই রকম একজন ভালো যুবক নিখোঁজ থাকবে, এইটা মানা যায় না। যত তাড়াতাড়ি পারেন ছেলেটাকে উদ্ধার করেন। অন্য কাম ফালায়া রাখেন। আমি কিন্তু প্রতিঘণ্টাত খোঁজ নিব। আমি ঐসব চব্বিশ ঘণ্টা তিরিশ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিচ্ছি না আপনেক। কিন্তু তাই বলে মনে করবেন না এই কামে ঢিল দেওয়া যাবে। আমি এই ছাওয়ালেক, মানে এই যুবককে দেখতে চাই সে তার বাড়িত ফিরিছে।

টেলিফোন হলে খটাস করে রেখে দেওয়া যায়। তাতে বোঝানো যায় যে অপর পক্ষের প্রতি কতটা বিরক্ত সে, অথবা কতখানি রেগে আছে সে। মোবাইলের লাইন কেটে দেবার সময় অতটা শব্দ উৎপাদন করা যায় না। তবু জোরে টিপে লাল বোতামটা প্রায় দাবিয়ে দেবার উপক্রম করে হামিদ উকিল। বাদলদের বোঝাতে চায় সে নিজেও কতখানি বিরক্ত এবং উদ্বিগ্ন।

এমদাদ এবার অনুরোধের সুরে বলে– কিন্তু শুধু পুলিশকে বললেই তো হবে না হামিদ ভাই। ওরা খালেদকে তুলে নেবার সময় নিজেদের পরিচয় দিয়েছে আইনের লোক বলে। পুলিশ ছাড়াও তো দেশে আরও বেশ কয়েকটি সংস্থা আছে। সেগুলোতেও যে একটু খোঁজ নিতে হয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হামিদ উকিল তার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কী যেন চিন্তা করে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে– অন্য কোনো সংস্থা নয় রে ভাই। এটা স্রেফ ধাপ্পা। তুলে নিয়ে গেছে গুন্ডারা। হতে পারে তারা ভাড়াটে কিলার, ইয়ে... মানে ভাড়াটে লোক।

কিন্তু তার জন্য তো একটা মোটিভ থাকতে হবে। কারণ থাকতে হবে। এমন কোনো ঘটনা ঘটতে হবে যাতে খালেদ ইনভলভ ছিল। কিন্তু তেমন কোনো ঘটনার কথা কেউ জানে না। খালেদ কারো সঙ্গে কোনো ধরনের গোলমালে জড়ায়নি। কারো কোনো স্বার্থহানি করেনি। কারোও সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা নেই। বড় করে শ্বাস ফেলে হামিদ উকিল। তারপর জ্ঞানদানের ভঙ্গিতে বলে– ভাইরে, আমাদের বাড়ির কোন ছেলেটা যে কী করতিছে তা কি আমরা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি? পারি না। এখন কি আর সেইদিন আছে? বাড়ির সবার সঙ্গে সবার কি আর সব কথা শেয়ার করা হয়? হয় না। এখন একবাড়িত থাকলেও কেউ বলতে পারে না আরেকজন কী করতিছে, কার সাথে মিশতিছে। আমি বলতিছি না খালেদ কোনো খারাপ কামে জড়িত। কিন্তু মানুষের কোন কামে যে কার স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটে, কে যে নিজের অজান্তেই কখন সাপের ল্যাজেত পা দিয়ে বসে, কেউ তা বলতে পারে না। আমি শুনিছি খালেদ চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করছিল। ভালো ব্যবসা করতিছিল। ব্যবসা বড় সেনসিটিভ জিনিস। কার যে কখন শত্রু তৈরি হয় কেউ বলতে পারে না। সেই কারণেই বলতিছি যে, এইটা পুলিশ করেনি। অন্য কোনো সংস্থাও করেনি। করিছে পুরাপুরি তার কোনো গোপন শত্রু। তা যা-ই হোক, আমাদের দরকার ছাওয়ালডাক ভালোয় ভালোয় উদ্ধার করা। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমার তরফ থেকে পুরা চেষ্টা জারি থাকবে।

শেষের বাক্যটা তাদের কানে বহু ব্যবহৃত হতে হতে মুখস্ত হয়ে যাওয়া স্তোকবাক্যের মতো শোনায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেছে অথচ বাইরে বেরিয়ে তার কোনো চিহ্নই দেখতে পায় না বাদল। একটা জলজ্যান্ত যুবক নিখোঁজ হয়ে গেল, মনেই হচ্ছে না তাতে পৃথিবীর কিছু আসে-যায়। তাহলে সব ক্ষতিই কি কোনো-না-কোনো মানুষের একান্ত একক ক্ষতি? বড়জোর পরিবারের ক্ষতি? এটাই যদি সত্যি হয় তাহলে পৃথিবীর সব মানুষকে কী করে একটা জাতি বলা যায়? বাদল আজ প্রথম স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে, আসলে 'মানবজাতি' শব্দটা শুধু কিছু মানুষের কিছু উদ্দেশ্য পুরণের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। বড়জোর এটি রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের প্রতি ভয়ানক আস্থাশীল কয়েকজন মানুষের বসার কল্পনাবিলাস। সেই রবীন্দ্রনাথও তো ছোটছেলে শমীকের মৃত্যুর পরে বাইরে তাকিয়ে দেখেছিলেন রাতের আকাশে জোৎস্নার বিন্দুমাত্র কমতি নেই। তাঁর পুত্র হারানোর শোকে সমমর্মিতা জানিয়ে একটা বৃক্ষপত্রও কোনো বেপথু আচরণ করছে না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর রাতেও কী তাঁর অসংখ্য ভক্ত স্ত্রীসঙ্গম করেনি! তাহলে কারো অনুপস্থিতিতেই আসলে অন্য কারো কিছু আসে-যায় না। ক্ষতি যা হয় তা ব্যক্তিগত ক্ষতি, পরিবারিক ক্ষতি, খুব বেশি হলে গোষ্ঠীর ক্ষতি।

উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে আসার পরে বাদলের মনে হয়, কোথায় এসেছে এবার তা খেয়াল করা উচিত। চারদিকে তাকিয়ে নিজের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করে। মেথরপট্টির কাছে চলে এসেছে সে। বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় বউ ভয়ে ভয়ে দূরে যেতে মানা করেছে। বাড়ি থেকেই যদি মানুষকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে আর বাইরেটাকে ভয় করে লাভ কী বলে সে ক্লিষ্ট হেসে বেরিয়ে এসেছে।

তবে সে যে এদিকে চলে আসবে নিজেও ভাবেনি। এখানে কেন এলো সে? প্রশ্নটা মনে এলো বটে, তবে উত্তর খোঁজার কোনো আগ্রহ পায় না নিজের মধ্যে। এসেছে, এখন ফিরে যাবে। তবে হাঁটতে আর ভালো লাগছে না। একটা রিকশা পেলে হতো।

তখন একটা ক্রিং ক্রিং বেল বেজে ওঠে। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে একটা রিকশা এসে দাঁড়িয়ে যায় গা ঘেঁষে। কানে ভেসে নিজের নাম– এদিক কই যাস বাদল?

সিটে বসে আছে আজাহার। তাকে দেখলেই সবসময় মন ভালো হয়ে যায় বাদলের। আজ এই পরিস্থিতিতেও কিঞ্চিৎ ভালো লাগে। একই সঙ্গে স্কুলে পড়ত ওরা। বেশিদূর যেতে পারেনি আজাহার। এইট বা নাইনে উঠে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। অথবা তাকে পড়া থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল তার বাপ। নিজের পান-বিড়ির দোকানে বসিয়ে দিয়েছিল। বাদলরা ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার সময়ই বিয়ে করেছিল আজাহার। সেটাও বাপের কথাতেই। যৌতুক হিসাবে পেয়েছিল অগ্রণী ব্যাংকের পিয়নের চাকরি। রাতদিন সেই চাকরি খোঁটা দিত বউ এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। ঘটাং করে একদিন চাকরির ছেড়ে দিয়ে রিকশা চালানো শুরু করল আজাহার। রিকশাঅলার সাথে কী ঘর করা যায়! অতএব পত্রপাঠ বিদায় নিল বউ। আজাহার এখনও রিকশাই চালায়। সকালবেলা দুই-তিনটা পেপার কিনে বসে বাড়ির সামনের পৌরসভার বাঁধানো বেদিতে। পাড়ার বুড়োরা এসে জোটে। তাদের পত্রিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো পড়ে শোনায় আজাহার। তারপর ৯টা বা ১০টা বাজলে গোসল করে পানি-পান্তা খেয়ে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

বাদলের কাছে রীতিমতো হিরো আজাহার। এমন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন লোকও নেই এই শহরে।

আজাহার ডাকে– উঠে আয় দোস্তো।

নির্দ্বিধায় উঠে বসে বাদল।

AMARBOI.COM

রিকশার প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতেই কথা বলতে থাকে আজাহার– খালেদের কোনো খবর পাওয়া গেল?

নাহ!

পাওয়ার কথাও নয়।

স্বগতোক্তির মতো করে নিচুকণ্ঠে বললেও আজাহারের কথাটা ঠং করে বেজে ওঠে বাদলের তন্ত্রীতে। কী বললি? কী বললি? তুই কি কিছু জানিস?

বিব্রত হয় আজাহার। বলে– না না। কিন্তু রিকশা চালাই তো ভাই। এতসব জিনিস দেখতে হয়! দুনিয়াডা আর দুনিয়া নাই রে ভাই।

চৌকির পাড়ে পৌঁছে একটা চায়ের ঘুমটির সামনে দাঁড়ায় আজাহার– এই দোকানডাত খাঁটি গরুর দুধের চা পাওয়া যায়। খাবু এককাপ?

চল খাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিকশা থেকে নেমে বেঞ্চে বসার সাথে সাথেই মনে পড়ে, তাদের ছেলেবেলায় এই চত্বরে রথের মেলা বসত। স্কুলে পড়ার সময় বড় মামার সাথে তারা দুই ভাই এসেছিল মেলায়। তৎক্ষণাৎ-ই হঠাৎ মনে পড়ে খালেদের সাথে তার ছোটবেলার তেমন কোনো স্মৃতি নেই। একসাথে তারা দুই ভাই কোনো জায়গায় বেড়াতে গেছে, বা একসাথে কোনো অ্যাডভেঞ্চার করেছে, তেমন কোনো ঘটনা মনেই পড়ে না। তাহলে কি দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনো দূরত্ব রয়ে গিয়েছিল? বাদলের ইনট্রোভার্ট স্বভাব বাড়ির সকলের কাছ থেকেই তাকে একটু দূরত্ব এনে দিয়েছিল। তাই বলে ছোট ভাইয়ের সাথে তার কোনো জ্বলন্ত আনন্দ-বেদনার স্মৃতি থাকবে না! এই প্রথম বাদল নিজের ইনট্রোভার্ট স্বভাবকে ধিক্কার জানায়। কোনো কিছুই সে কোনোদিন শেয়ার করেনি বাড়ির কারো কাছেই। অথচ খালেদ তাকে হঠাৎ-ই কয়েকদিন আগে বলেছিল– ভাইয়া তোমার কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি রেডি করো। এবারের বইমেলায় বের করো। তোমার খরচ আমি দেব।

এমন ফিলিংস বাদল কি কোনোদিন অনুভব করেছে খালেদের জন্য? নিজেকে আজ তার খুব ছোট মনে হতে থাকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকেলে আসরের নামাজের পরে মা হঠাৎ আসে বাদলের ঘরে।

শশব্যস্ত হয়ে উঠে বাদল। তার বিয়ের পরে মা কোনোদিন এই ঘরে ঢুকেছে কিনা সন্দেহ। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এই ব্যতিক্রমী আগমনের কারণ খোঁজে। মাকে অসম্ভব মলিন লাগছে। লাগারই কথা। কারণ বাড়ির কারো চেহারাতেই উজ্জ্বলতা নেই। কিন্তু মাকে এত বেশি অন্যমনস্ক লাগছে কেন?

কিছু বলবে মা?

মায়ের মুখে কোনো উত্তর নেই। মনে হয় শুনতেই পায়নি বাদলের কথা। বাদল তখনো বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। পরনের লুঙ্গি অবিন্যস্ত। বালিশ কোলে নিয়ে বসে আছে। মা অন্যমনস্ক ভাবেই এসে বসে বিছানার এক কোণে। হাতের তসবিহ ঘুরছে আঙুলের নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে। বাদল একটু বিমূঢ় তাকিয়ে থাকে। আবার প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবে। তার আগেই মায়ের ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয়– তোর আলীম মামাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে আছে বাবা?

মনে আছে। বিশেষ করে খালেদকে তুলে নিয়ে যাওয়ার দিন থেকে বেশি বেশি করে মনে পড়ছে আলীম মামার কথা। সেই রাতটাকে আবার যেন বারবার দেখতে পাচ্ছে বাদল।

তখন প্রতিটি রাতই ভয়ানক। প্রতিটি দিনই ত্রাস। রাত নামলেই বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে টহলে নামে যেন আতঙ্ক। বাইরে রাতের পাখি ডেকে উঠলেও কারা যেন তাকে নিষেধ করে– হিস্‌স্‌ চুপ চুপ! কুকুর ডাকলেও সে ডাকে হাঁক-ডাক নেই, কেবল বাতাস ভারি করা কান্নার সুর। ঘরে ঘরে ছোট বাচ্চারাও তখন কীভাবে যেন জেনে গেছে রাতের বেলা জোরে কান্নাকাটি করা যাবে না। সন্ধ্যার পরে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আলো নিভিয়ে দিতে ব্যস্ত সবাই। যেন অন্ধকারই একমাত্র আবরণ হয়ে বাঁচাবে তাদের। বেতো বুড়োদের কোঁকানি-কাতড়ানি ঘরের বাইরে যায় না। পোয়াতি মায়েরা তাদের পেটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচ্চাকে নিষেধ করে রেখেছে জোরে নড়াচড়া না করতে। রাস্তায় পায়ের শব্দ থাকলেও সেগুলি ত্রস্ত, সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ। তাদের পায়ের ছন্দের আতঙ্ক ঘরের মধ্যেকার আতঙ্ককে আরো বাড়িয়ে দেয়। জেগে থাকা মানুষরা বারবার দোয়া ইউনুস পড়ে বুকে ফুঁ দেয়। আর এক রকম শব্দ আসে। ভারি বুটের শব্দ। যেন মূর্তিমান দানব হেঁটে যাচ্ছে অন্ধকার বাড়িয়ে দিয়ে দিয়ে। রাতের বেলায় দরজায় ধাক্কা বা কড়া নেড়ে ওঠা মানেই মৃত্যুর গন্ধ ছড়িয়ে পড়া। সেই রকম একরাতে দরজায় দমাদম লাথি এবং ধাক্কার শব্দে আঁতকে উঠেছিল তাদের বাড়ির সবাই। সবাই বিমূঢ়ের মতো তাকাচ্ছিল একজন আরেকজনের দিকে। অবশেষে এসে গেল সেই মৃত্যুদূত তাদের বাড়িতেও! কে খুলে দেবে দরজা! নানা তাকাচ্ছে আব্বার দিকে, আব্বা তাকাচ্ছে আলীম মামার দিকে। বাইরে ধাক্কাধাক্কি তখন অশ্রাব্য খিস্তিতে পরিণত হয়েছে– মাদারচোদ, গেট খোল! শুয়ারকা বাচ্চা, খোল গেট!

বিছানায় তখন উঠে বসেছে বাদল।

মনে আছে, শীতের রাত। মেঝেতে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ির বড়রা। কারো পরনেই যথেষ্ট শীতের পোশাক নেই। সবাই যেন ভুলে গেছে শীতের কথা। কিন্তু কাঁপছে হি হি করে।

শেষে আলীম মামাই দরজা খুলে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে আটজন মানুষ। খাকি পোশাক পরা। মাফলার মুখে-মাথায় প্যাঁচানো গালপাট্টার মতো। তাদের প্রত্যেকের কাঁধে বন্দুক। দলের একেবারে সামনে মজিদ বিহারি। তাকে দেখে আব্বা যেন একটু সাহস পায়। তার দোকানের নিয়মিত খদ্দের মজিদ বিহারি। তাছাড়া পাড়ার ক্লাবে রাতে তাস খেলার পার্টনার ছিল দুজনে। আব্বা একটু হাসির চেষ্টা করে। কিন্তু কথা বলার সময় কণ্ঠ ঠিকই কেঁপে ওঠে আতঙ্কে– কেয়া হুয়া মজিদ ভাই।

কুছ নেহি।

তো এতনি রাতমে?

মুলক-কে লিয়ে। পাকিস্তানকে লিয়ে।

তার মুখ থেকে কথার সঙ্গে সঙ্গে ভকভক করে বের হয় দেশি মদের গন্ধ।

হঠাৎ কী হয়, ছয় বছরের বাদল ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিহারি জোয়ানদের একজন ধমকে ওঠে– চুপ হারামিকা বাচ্চা।

মজিদ তাকে বাধা দেয়। কাছে এসে কোলে তুলে নেয় বাদলকে। বলে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোই ডর নেহি চাচা। হাম হায় না। চুপ কর বেটা। চুপ যা।

এই রাতেও, এই আতঙ্কের মধ্যেও, মজিদ বিহারির সম্বোধনের পরিবর্তন টের পায় বাদল। অন্য সময় দেখা হলে মজিদ চাচা তাকে 'সাহেবজাদা' এবং 'আপনি' বলে সম্বোধন করত। এখন তুমি থেকে একেবারে তুই।

বেশিক্ষণ আদিখ্যেতা সয় না তাদের। আলীম মামার দিকে তাকিয়ে বলে– চল্!

কোথায়? এই রাতে... !

হাফিজ সাহাব বোলা রাহা হায় উসকো।

হাফিজ সাহেব! আবদুর রহমান হাফেজ!

আতঙ্কের মধ্যে আরো আতঙ্ক জেঁকে নামে শীতার্ত ঘরটাতে। একমাস আগে, একরাতে ছাতনী খেলার মাঠে সাড়ে তিন শ বাঙালিকে জবাই করেছে আবদুর রহমান আর তার দলবল। হাফেজ ফতোয়া দিয়েছে ৭ জন বাঙালিকে কোতল করলে একটা উমরা হজের ছোয়াব পাওয়া যাবে। সেই হাফেজের কোপদৃষ্টিতে আলীম কীভাবে পড়ল! সে তো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। ক্লাস বন্ধ বলে বাড়িতে বসে আছে। আওয়ামী লীগ করে না, ছাত্রলীগ করে না, কোনোদিন কোনো মিছিলে যায়নি। একমাত্র যুবক এবং বাঙালি ছাড়া তার কোনো অপরাধ নেই। সেই আলীমকে কেন এই রাতে ডেকে পাঠাবে আবদুর রহমান হাফেজ! নানা অনুনয়ের সুরে বলে মজিদ বিহারিকে– ছেলের বদলে আমি গেলে হয় না?

তাই হয়! হাফিজ সাহাব যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে বিহারি দলকে। তখন তাদের নাম হয়েছে আল শামস। আবদুর রহমান হাফেজ সেই দলের জেলাপ্রধান। তিনি যখন বলেছেন, তখন আলীমকেই যেতে হবে।

আরো কী কী যেন বলার চেষ্টা করছিল আব্বা। তখন মুখোশ পুরোপুরি খুলে গেছে মজিদ বিহারির। কোল থেকে বস্তার মতো করে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে বাদলকে। দুইজনকে ইশারা করতেই তারা আলীম মামাকে চেপে ধরেছে দুইদিক থেকে। তারপর ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে গেছে দরজার দিকে। তার বেশি দেখেনি বাদল।

বাকিটুকু শোনা।

সারারাত ঘুমায়নি বাড়ির কেউ।

ফজরের আজানের সাথে সাথে নানা ছুটে গেছে কছিমুদ্দিন মোক্তারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে। মুসলিম লীগের নেতা। সে কথা বলেছে হাফেজ আবদুর রহমানের সাথে। ঝাড়া অস্বীকার করেছে হাফেজ। সে কাদিরকে তুলে আনতে পাঠায়নি মজিদ বিহারিদের।

এই বয়সেও সেই পাঁচ বছর বয়সের অনুভূতি পুরোটাই স্মৃতির পরত খুলে জেগে ওঠায় মনের মধ্যে থরথরিয়ে কেঁপে উঠতে থাকে বাদল। মা কি তাহলে বুঝে গেছে যে আলীম মামার মতো একই পরিণতি হয়েছে খালেদের?

মা স্বগতোক্তির মতো করে বলে– কিন্তু এখন তো দেশটা স্বাধীন বাংলাদেশ!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদলকে দেখেই আড্ডার সুর কেটে যায়। নাকি আগে থেকেই এমন চলছিল। কেউ ভালো করে কথা বলতে পারছে না। তাকাতে পারছে না বাদলের মুখের দিকে। সেলিমুজ্জামান এলিট ফোর্সের দপ্তরে গিয়েছিল। তার বড় ভাই কর্নেল। সেই রেফারেন্স নিয়ে গিয়েছিল সে। তার সাথে খুবই ভালো আচরণ করা হয়েছে। কিন্তু দপ্তরে কোনো তথ্য নেই খালেদের ব্যাপারে। তারা আশ্বস্ত করেছে এই বলে যে ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হলো।

আলতাফ আর কামাল গিয়েছিল সরকারি দলের বিভিন্ন নেতার দুয়ারে দুয়ারে। আশ্বাস মিলেছে ঝুড়ি ঝুড়ি।

আলতাফ আরো একটা কাজ করেছে। ভাড়াটে কিলার এবং ক্যাডার হিসাবে সবচেয়ে কুখ্যাত গ্রুপটির সাথে দেখা করেছে। তারা পিস্তল ছুঁয়ে কিরে-কসম কেটে বলেছে যে এই কাজ তারা করেনি। খালেদকে তারা এমনকি চেনেও না।

বিস্বাদ লাগছে। তবুও চায়ের কাপ আসে। চুমুক দিতে গিয়ে সেলিমুজ্জামান জিজ্ঞেস করে– খালেদের ব্যবসার পার্টনার আর বন্ধুদের সাথে কথা বলেছিস?

মাথা নাড়ায় বাদল। প্রত্যেকের সাথেই কথা বলেছে সে। এ ব্যাপারে তাদের বিন্দু-বিসর্গ ধারণাও নেই। কারো সাথে কোনো গোলমাল হয়নি খালেদের। বরং আগের রাতে তারা এলজিআরডি-র ঠিকাদারি পাওয়ার আনন্দ সেলিব্রেট করেছে একসাথে মডার্ন হোটেলে পরোটা আর খাসির মাংস খেয়ে। খালেদের এই খবরে তারা পরিবারের মতোই মুষড়ে পড়েছে। খালেদ ছাড়া তাদের ব্যবসা-গ্রুপ অচল।

খুব আনমনা কণ্ঠে আলতাফ বলে– লোরকার কথা মনে পড়ে!

লোরকা! ফেদেরিকো! ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকা।

পাবলো নেরুদার মতে– 'স্পেনের সেরা আত্মা।' তাঁর নিজের ভাষায় 'মানব গোষ্ঠীর ভাই' এবং 'গ্রানাদা রাজ্যের সন্তান'।

সেই গ্রানাডা রাজ্য থেকেই গুম হয়ে গেলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান কবি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহা কী ভালোই হতো যদি তিনি আমেরিকা ছেড়ে দেশে না ফিরতেন!

বাদল বিড়বিড় করে বলে– ফিরতে যে তাঁকে হতোই! স্পেনের আত্মা কি স্পেন ছেড়ে দূরে সরে থাকতে পারে?

আহা আমেরিকায় থেকে গেলে তো এইভাবে গুম হতে হতো না তাঁকে! তাঁর মৃতদেহটাও কেউ পায়নি খুঁজে। আমেরিকায় থাকলে এমন দুর্ভাগ্য হতো না তাঁর। এমন অপূরণীয় ক্ষতিটা হতো না মানবজাতির।

আমেরিকাতে তো তিনি ভালোই ছিলেন। সেলিমুজ্জামান বলে– 'নিউইয়র্কে কবি' বইয়ের ভূমিকা দেখো।

প্যারিস এবং লন্ডন হয়ে লোরকা নিউইয়র্কে পৌঁছান ১৯২৯ সালের জুনমাসের শেষদিকে। যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন তাঁর গ্রানাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রিয় শিক্ষকও। নিউইয়র্কে পৌঁছে বাড়িতে যে চিঠি লিখছেন লোরকা, তাতে বিপল উচ্ছ্বাস আর আনন্দের চিহ্ন। ছয়দিনের আরোগ্যযাপনের তুল্য সমুদ্রপাড়ি, তারপর নতুন শহরকেন্দ্রে হাডসনপাড়ের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাম্পাসে সরল ব্যক্তিত্ববান ছেলেমেয়েদের হাসি হুল্লোড়, আর তাঁর উঁচুতলার নিঃশব্দ ঘর ঠাণ্ডা হয়ে আছে নদীর বাতাস উঠে, উজ্জ্বল আকাশ, সুন্দর আবহাওয়া, ছাত্রহলে নামমাত্র মূল্যে প্রচুর ও রকমারি খাওয়া-দাওয়া, জানালাতে অতিকায় স্কাইস্ক্র্যাপার, বর্ণিল বিজ্ঞাপনে রাঙানো ব্রডওয়ে, এপার ওপার টানা অপার বুলভার, আর অচ্ছেদ্য যানযন্ত্রে প্রাণোচ্ছলতার চিহ্ন সবখানে। এতই ভালো লেগে গেছে তাঁর শহরটাকে, মনে হচ্ছে পুরোপুরি মার্কিনী হয়ে উঠবেন তাড়াতাড়ি; তা নইলে এখানকার বিপুলতার পাশে নিজেকে খুব গ্রাম্য বেমানান লাগবে। পরের চিঠিতে লিখছেন যে একটি নতুন কবিতার বই লেখার জন্য বিপুল পরিশ্রম করছেন তিনি। এমন একটি বই তিনি লিখতে চাইছেন যা হবে নিউইয়র্ক নগরের একটি অন্তর্ভেদী ভাষ্যের মতো, আগের সব লেখা ম্লান হয়ে যাবে এই কবিতার কাছে।

কিন্তু নিউইয়র্কে তাঁর থাকা হলো না। বিড়বিড় করে বলে বাদল।

থাকা হলো না মানে তিনি থাকতে পারলেন না। আলতাফ জোর দিয়ে বলে– প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই তিনি টের পেয়ে গেলেন যে তাঁর অন্তরাত্মার সাথে কিছুতেই খাপ খাচ্ছে না নিউইয়র্ক। এমনকি আমেরিকার কোনো কিছুই তাঁর মনের মতো নয়।

ঠিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাইতো দেখা গেল, যে ইংরেজি শিক্ষার বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাঁর আমেরিকায় পাড়ি জমানো, সেই ভাষাশিক্ষার ক্লাসে কয়েকদিন পর থেকেই অনুপস্থিতি। প্রথম সেমিস্টার শেষের পরীক্ষায় বসলেন না। দ্বিতীয় সেমিস্টারে ক্লাসেই উপস্থিতি বিরল। বরং হাতে ছোট একটি অভিধান নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাস্তায় রাস্তায়। চোখধাঁধানো নিউইয়র্কের আড়ালের সত্যিকারের পরিচয় জানার জন্য সঙ্গী জুটিয়ে চষে ফেলছেন এলাকার পর এলাকা। তাঁকে দেখা যাচ্ছে চীনাদের রেস্তোরা থিয়েটারে, কোনি আইল্যান্ডের উত্তাল প্রমোদপার্কে, ব্রংক্স জ্যু-এ, হার্লেমপট্টিতে, নিগ্রো ক্যাবারেগুলিতে, ইহুদি সিনাগগে, ব্রডওয়ের থিয়েটারে, রাগরি মাঠে, এমনকি ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ার মার্কেটে যেখানে টাকার জন্য একে অপরের মাংস নিয়ে টানাটানি করছে শেয়ারবাজরা।

মাত্র নয় মাসের মাথায় নিউইয়র্ক ছাড়লেন লোরকা। তখন তাঁর চোখ থেকে হারিয়ে গেছে প্রথম নিউইয়র্ক দর্শনের বিহ্বলতা। তখন নিউইয়র্ক তাঁর কাছে এমন এক দুনিয়া যেখানে অংকের হিসাবের ভেতরে ভেসে বেড়াচ্ছে মানুষ, কর্তৃপক্ষ একের পর এক সিমেন্টের পাহাড় তুলছে ছোট ছোট বিস্মৃত জীবপ্রাণীর হৃৎপিণ্ডের উপরে।

অন্যদিকে গ্রানাদা তাঁকে ডাকছে। স্পেন তাঁকে ডাকছে। স্পেন তার মহৎ সন্তানগুলিকে কাছে পেতে চাইছে। কারণ তখন স্পেন এক পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ। সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে কি থাকতে পারেন লোরকার মতো মানুষ। লোরকা কেমন মানুষ ছিলেন? কবি রাফায়েল আলবার্তি জানাচ্ছেন– লোরকা মানেই 'বিদ্যুতের মতো প্রবাহিত সহানুভূতি, আবেগ, অপ্রতিরোধ্য জাদুময় পরিবেশ, যা তাঁর ব্যক্তিত্বকে আবৃত করে রেখেছিল, তা যেন গলে গলে পড়ত যখন তিনি কথা বলতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন, নাটকের দৃশ্য রচনা করতেন, অথবা পিয়ানো নিয়ে গান গাইতেন। যেখানেই লোরকা গিয়েছেন, পিয়ানো হাতের কাছেই পেয়েছেন।' আরেক কবি পেড্রো সালিনাস এর সাথে যোগ করে দিয়েছেন অমোঘ একটি বাক্য– 'তাঁর পিছু ধাওয়া না করে আমাদের কোনোই উপায় ছিল না।'

লোরকা তখন সৃষ্টিতে মশগুল এবং মুখর। স্পেনে ফিরে এসে খুলে গেছে তাঁর সৃষ্টিমুখ সহস্র ধারায়। স্পেনে আসছেন তখন বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান লেখক-কবিরা। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে উঠছে এই মেধাবী কবির। বিশেষ করে পল ভ্যালেরি এবং আর্থার এডিংটনের সঙ্গে গড়ে উঠেছে গাঢ় বন্ধুত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধন। বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে সালভাদর দালি এবং লুই ব্রুনেলের সঙ্গে। নিজের কবিতা আবৃত্তি করে বেড়াচ্ছেন কাফে-কবিসভা-শ্রমিকসভা-কৃষকসভা, এমনকি রাজনৈতিক সভাগুলিতেও। ডিলান টমাসের মতো লোরকাও মনে করতেন যে, কবিতা শুধু পাঠের বস্তু নয়, শ্রবণেরও। শুধু পাঠ করে কবিতার অর্ধেকটাও উপলব্ধি করতে পারেন না পাঠক। আবৃত্তির মাধ্যমে বরং কবিতাকে সরাসরি শ্রোতার হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায়। একই সঙ্গে তিনি সংগ্রহ করছেন লোকগীতি, লিখছেন গীতিনাট্য। এই সময়ের লেখা 'জিপিসি ব্যালাড' তো বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলোর একটি।

স্পেন তখন পরিবর্তনের হাওয়ায় কম্পমান। ১৪ এপ্রিল ১৯৩১-এ স্পেন রিপাবলিক ঘোষণা হলো। ক্ষমতা এবং দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন রাজা। বুদ্ধিজীবীদের তৎকালীন নেতা মিগেল দে উনামুনো স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে ফিরে এলেন দেশে। বছরের শেষে পাশ হলো নতুন রিপাবলিকের সংবিধান। প্রাথমিকভাবে ধর্মসংস্কারমুক্ত মানবতাবাদী সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় প্রাণিত সংবিধান। গ্রামে-গঞ্জে-মফস্বলে রিপাবলিকের আদর্শ প্রচার এবং মানুষকে সেই আদর্শের সাথে একাত্ম করার লক্ষ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গঠিত হলো 'লা বারাকা' থিয়েটার দল। তার পরিচালক নিযুক্ত হলেন লোরকা। সারা দেশ ঘুরলেন নাটকের দল নিয়ে।

কিন্তু নতুন রিপাবলিকের প্রতি আঘাত এলো চরমভাবে। দক্ষিণপন্থিরা ক্ষমতা দখল করে বসল। তখন ছন্নছাড়া অবস্থা স্পেনের। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কট্টরপন্থি ফ্যালাঞ্জিস্ট দল গড়ে উঠেছে দেশে। শুরু হলো গৃহযুদ্ধ। এই সময় দেশ ছাড়লেন হুয়ান রামোন হিমেনেথসহ স্পেনের শীর্ষস্থানীয় অনেক লেখক। কিন্তু লোরকা দেশত্যাগ করতে রাজি নয়। অবচেতনে বোধহয় নিজের আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস পেয়েছিলেন কবি। কবিতায় লিখলেন–

খুব বুঝতে পেরেছি, খুন হয়েছি আমি।
তারা চষে বেরিয়েছে কাফে, সমাধিভূমি আর গির্জা,
গোলাঘর আর আলমারি করেছে তছনছ।
তিনটা কঙ্কাল লুট করেছে সোনার দাঁতের লোভে।
তারা কি পেয়েছে খুঁজে কখনো আমাকে?
তখনো পায়নি তারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস পেয়েও দেশ ছাড়লেন না লোরকা। ১৯৩৬-এর মধ্য-জুলাইতে মাদ্রিদে রাফায়েল মার্তিনেজ নাদাল তাঁকে তুলে দিয়ে এলেন গ্রানাদার ট্রেনে। ১৯ আগস্ট ভোরবেলা লোরকাকে তুলে নিয়ে গেল ফ্যালাঞ্জিস্টরা। তারপর আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি জীবিত বা মৃত লোরকার।

এই সংবাদ পেয়ে পাবলো নেরুদা হাহাকার জানালেন পত্রিকায়। আলবেয়ার কামু আত্মক্রোধে এবং ধিক্কারে ফেটে পড়ে লিখলেন– 'স্পেনের এই দৃষ্টান্তেই লোকে শিখেছে আমরা সঠিক হলেও হারতে পারি, বাহুবল পরাভব করতে পারে আত্মশক্তিকে, সাহস তার প্রাপ্য পুরস্কার পায় না'।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতা ঢেকে রাখল আড্ডাটিকে। অনেকক্ষণ পরে এই স্তব্ধতা ভাঙল বাদলের মৃদু হাহাকার-কাতর কণ্ঠস্বর– কিন্তু মানুষটা তো আর ফিরে আসেনি!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতে বারোটার পরে মোবাইল বন্ধ করে ঘুমানোর অভ্যেস বাদলের। কিন্তু আজ আর অফ করে না সে। যদি কোনো খবর আসে!

কোত্থেকে আসবে খবর?

হয়তো অপহরণকারীরা যোগাযোগ করবে। যদি তারা সত্যিই অপহরণকারী হয়। তাহলে তো তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে খালেদকে জিম্মি বানিয়ে মুক্তিপণ আদায় করা।

কিন্তু যদি ওরা খালেদকে মেরে ফেলে!

চিন্তাটা আসামাত্রই নিজের ভেতরটা কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে। সেই কাঁপুনি থামাতে সময় লাগে অনেকখানি। মনে মনে আওড়ায়– না না মারবে কেন? মারলে তো ওদের কোনো লাভ নেই। ইতালির মাফিয়াদের কথা মনে পড়ে। অপহরণ শব্দটা এলেই মারিয়ো পুজো আর কাজী আনোয়ার হোসেনের কল্যাণে মাফিয়াদের কথা মনে আসতে বাধ্য। তাদের সূত্র অনুসারে আর্থিক লাভালাভ ছাড়া অপহরণকারীরা কখনো কাউকে খুন করে না। এমনকি নিজের ভাইয়ের মৃত্যুর বদলা নেবার জন্যেও না। এই ছোট্ট শহরে হয়তো অল্প সময়ে খালেদের বড় ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার ব্যাপারটা চোখে পড়ে গিয়েছিল কোনো গ্রুপের। তারাই নিশ্চয়ই অপহরণের কাজটি করেছে বা করিয়েছে। ফোন আসবে। বাদল নিজেকে এই বলে নিশ্চিত করতে চায় যে ফোন আসবে। খালেদের মুক্তির বিনিময়ে বা খালেদকে ছেড়ে দেবার বিনিময়ে টাকা চেয়ে ফোন আসবে। হয়তো সেই টাকার পরিমাণটা হবে বিশাল। হয়তো এতই বিশাল হবে তা যে খালেদের ব্যবসার পুরো পুঁজি, সঞ্চয়, তাদের পারিবারিক সঞ্চয়, এমনকি বাড়িঘর বিক্রি করলেও সেই পরিমাণ টাকা জোগাড় হবে না। তবু ফোন তো আসুক! আসুক ফোন! টাকা চেয়ে ফোন আসুক। খালেদের মুক্তির বিনিময়ে মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসুক! অন্তত এটুকু জানা যাক যে তার ভাই বেঁচে আছে। ফোন আসুক। নিজের ভাবনাটা ঠোঁটে চলে আসে বাদলের। বিড়বিড় করে জপমন্ত্রের মতো বলতে থাকে– ফোন আসুক! ফোন আসুক!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ফোন আসে।

এতই আকাঙ্ক্ষিত সেই ফোনকল যে তা আসার সাথে সাথে আকাঙ্ক্ষা পূরণের ধাক্কায় কিছুক্ষণের জন্য বিবশ হয়ে যায় বাদল। নিজেকে সামলানোর কথা মনে ছিল না। একটানা রিং বেজে চললেও ফোন রিসিভ করা হয়ে ওঠে না তার। তখন কেবলমাত্র দুচোখে ঘুম নেমে আসা বউ তার ফোনের শব্দে জেগে গিয়ে চাপাস্বরে স্বামীকে বলে– ফোন ধরছ না কেন?

তাই তো!

সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে মোবাইলের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতেই রিং টোন বন্ধ হয়ে যায়। মোবাইলটাকে বালিশের তলা থেকে টেনে বের করে বোকার মতো হাতে নিয়ে বসে থাকে সে। তারপর বোধকরি খেয়াল হয় রিং ব্যাক করার। রিং ব্যাক করে। এবং আরও বেশি বোকা হয়ে লক্ষ্য করে যে ওপারে কোনো রিং হচ্ছে না। নম্বরটা তার মানে বন্ধ!

নিজের ওপর তার প্রচণ্ড রাগ হয়। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখার বদলে সে তো পুরোপুরি জড়ভাব হয়ে পড়েছে। এই যে কলটা সে ধরতে পারল না নিজের বিমূঢ়তার জন্য, হয়তো এর সাথে সাথেই লিঙ্ক হয়ে গেল খালেদের সংবাদ পাওয়ার শেষ সুযোগটা। দুঃখে এবং আত্মঘৃণায় নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করে তার। ঠিক সেই সময়ে আবার মোবাইল বেজে ওঠে। সে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। বউ তাড়া দেয়– ধরো ধরো!

সে সবুজ ইয়েস বাটনে টাচ দেয়। কানের কাছে নেয় মোবাইলকে। কিন্তু হ্যালো বলতে গিয়ে খেয়াল করে যে তার স্বর ফুটছে না। তার বদলে চোখ থেকে নেমে এসেছে জলের ধারা। গলা পরিষ্কার করার জন্য গলা খাঁকারি দেয় সে। তার গলা খাঁকারির শব্দ শুনেই ওপার থেকে কথা বলে ওঠে বোধহয় কলকারী– বাদল সাহেব বলছেন?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। বাদল বলছি।

কাঁপা কাঁপা গলায় বলে সে।

ওপার থেকে সেই কণ্ঠ বলে– আমি সাব-ইনসপেক্টর শাজাহান বলছি।

কে? বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে বাদল।

আমি সাব-ইনসপেক্টর শাজাহান। চিনতে পারছেন না?

কোনো ভনিতা না করেই উত্তর দেয় বাদল– না তো!

ঐ যে থানায় দেখা হলো আজ সকালে। মনে নেই? ওসি সাহেবের ঘরে। আপনার মা আর একজন মুরুব্বি সঙ্গে ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণে স্মার্ট পুলিশ অফিসারটির কথা মনে পড়ে বাদলের। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হয় অমন স্মার্ট একটা যুবকের নাম শাজাহান! এমন মধ্যযুগীয় নাম! তবে ভাবনাটা সরিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বলে– এবার মনে পড়েছে। বলেন।

প্রত্যাশায় কেঁপে ওঠে তার বুক এবং কণ্ঠও– খালেদের, মানে আমার ভাইয়ের কোনো খবর পাওয়া গেছে ভাই!

ওপাশ থেকে উত্তর দেবার আগে একটু যেন চিন্তা করে শাজাহান। দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলে– ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। আপনি কি একটু আসতে পারবেন?

কোথায়? থানায়?

না। থানাতে নয়। আপনাকে আসতে হবে দক্ষিণ বাইপাসের একেবারে শেষ মাথায়। যেটাকে যোগীর জঙ্গল বলে, সেই জায়গাতে। চিনতে পারছেন তো জায়গাটা?

পরিষ্কার চিনতে পারছে বাদল। তাদের ছোটবেলায় ঐ অঞ্চল ছিল সত্যিকারেরই জঙ্গল। দিনের বেলাতেও মানুষ সাহস পেত না একা যেতে। এখন জঙ্গল না থাকলেও মানুষ যেতে চায় না সহজে। কারণ ঐ জায়গা নাকি ফেনসিডিলের গুদাম। আর ইন্ডিয়ান মালের বড় স্মাগলারদের আখড়া। বছর বছর ডাক হয় যোগীর জঙ্গলের। বড় বড় গডফাদাররা ইজারা নেয় ঐ জঙ্গল। সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশে অলিখিতভাবে নিষেধ। ওখানে কী করছে খালেদ!

মোবাইলের ওপ্রান্ত থেকে আবার শোনা যায় শাজাহানের কণ্ঠ– আপনি কি নিজে আসতে পারবেন? নাকি আমি পুলিশ পিকআপ পাঠাব?

কিছু না ভেবেই বাদল বলে– না পারব। গাড়ি পাঠাতে হবে না। কোথায় যেতে হবে আমাকে? মানে ঠিক কোথায় আছেন আপনি?

বাইপাশের মাথায় চলে আসুন। এলেই আমাদের পেয়ে যাবেন।

বউ তো আগেই জেগে গিয়েছিল মোবাইলের রিং শুনে। বাতি জ্বালিয়ে বাদলকে কাপড় পরতে দেখে উঠে বসে বিছানায়– কী হয়েছে? কে ফোন করেছিল? কোথায় যাবে তুমি এত রাত্তিরে?

কাপড় পরতে পরতেই উত্তর দেয় বাদল– পুলিশের একজন অফিসার। থানায় দেখা হয়েছিল। সে ফোন করে আমাকে যেতে বলেছে যোগীর জঙ্গল এলাকাতে।

খালেদের খোঁজ পাওয়া গেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক নিশ্চিত করে বলেনি। বোধহয় কোনো খবর আছে।

তুমি এত রাতে ওখানে একা একা যাবে?

যেতে হবে। আর তো কেউ নেই যাকে সঙ্গে নেওয়া যায়।

চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবে বউ। তারপর বলে– তোমার বন্ধুদের কাউকে সঙ্গে ডেকে নাও না!

পাগল। এত রাতে কাউকে ডাকা যায়? সবাই ঘুমাচ্ছে।

যুগপৎ উষ্মা এবং খোঁচা প্রকাশ পায় এবার বউয়ের কথায়– যদি বিপদের সময় ডাকাই না যায়, যদি পাশে না-ই পাওয়া যায়, তাহলে আর বন্ধু কীসের!

তার বন্ধুদের যে বউ খুব একটা পছন্দ করে না বা পাত্তা দেয় না, জানে বাদল। অন্য সময় হলে বউকে এই খোঁচার উত্তর দিত সে। কিন্তু এখন নিঃশব্দে হজম করে। কাপড় পরা শেষ হলে বলে– এসো। গেটটা লাগিয়ে দাও।

ঘর থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয় তাকে। মা দাঁড়িয়ে আছে। একটু থতমত খেয়ে বাদল প্রশ্ন করে– এখনও ঘুমাননি মা?

মা তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাদের শুনতে পাওয়ার মতো বিড়বিড় করে বলে– এক ছেলেকে একলা যেতে দিয়ে যে ভুল করেছি, আরেক ছেলেকে একলা যেতে দেব না। আমিও সঙ্গে যাব।

বিরক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু উল্টো যেন একটু আশ্বস্তই হয় বাদল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে– চলেন।

বাইরে বেরিয়েই বুঝতে পারে, শাজাহানের প্রস্তাবমতো পুলিশের গাড়িতে করে যাওয়াই ভালো ছিল। রাস্তায় কোনো যানবাহন নেই। কোনো লোক পর্যন্ত নেই। রাতে রিক্সা চালায় যে নাইট প্যাডেলাররা তারা বোধহয় নাইট কোচের যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। হয়তো স্টেশনে গেলে রিক্সা পাওয়া যাবে। সীমান্ত এক্সপ্রেসের যাত্রী ধরার জন্য সেখানে থাকে কয়েকটা রিক্সা। আর শহরের বাকি কয়জন নাইট রিক্সা প্যাডেলার মূলত আনা-নেওয়া করে শহরের পাতিনেতা-ক্যাডারদের বাংলামদ আর রক্ষিতাদের।

এখন কী করা যায়!

এখান থেকে হেঁটে বাইপাসের যোগীর জঙ্গলে পৌঁছাতে সময় লাগবে অনেক। তার ওপর সঙ্গে মা থাকায় জোরে হাঁটাও যাবে না। বন্ধুদের মোবাইলে ডেকে তুলে লাভ নেই। এমদাদ ভাইয়ের একটা মোটর সাইকেল আছে বটে, তাতে তো আর মাকে তোলা যাবে না। একবার মনে হয় সাব-ইনসপেক্টর শাজাহানকেই আবার ফোন করে পিকআপ ভ্যান পাঠানোর জন্য অনুরোধ করবে নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে মা তার জন্য অপেক্ষায় না থেকে হাঁটতে শুরু করেছে। অর্থাৎ বাহনের অসুবিধার কথা বলে বাড়িতে ফেরত পাঠানোর কোনো অবকাশও তাকে দিচ্ছে না।

বাধ্য হয়ে সে যখন মনে মনে সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলে যে পুলিশ অফিসারকে ফোন করবে, ঠিক সেই সময় ঠুন ঠুন শব্দ করতে করতে তাদের সামনে আসতে থাকে একটা ভ্যানরিক্সা। মাল টানে এরা। এত রাতে হয়তো কোনো সাহা মহাজনের গুদামে মাল তুলে দিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। সে ডাকলেও ভ্যানঅলা যেতে রাজি হবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই। বরং না যেতে চাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবু সে হাত তুলতে যায়। কিন্তু তার আগেই তাদের সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়ায় ভ্যানচালক। বলে– এত রাতে কই যান মা-বেটা?

সে কীভাবে জানল তারা মা ও ছেলে?

চোখ তীক্ষ্ণ করে ভ্যানঅলার দিকে তাকায় বাদল। নাহ, আদৌ চেনা মনে হচ্ছে না। এমনকি একই ছোট মফস্বল শহরের বাসিন্দা হলেও তাকে কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ে না বাদলের।

ভ্যান থেকে নেমে ততক্ষণে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। নাকটা একটু ফুলে ওঠে বাদলের। লোকটার গা থেকে রাতের গন্ধ ছিটকে বেরুচ্ছে। রাতের গন্ধ! কথাটা মনে পড়াতে নিজেই একটু অবাক হয় বাদল। রাতের আলাদা কোনো গন্ধ আছে বলে কোনোদিন তো মনে হয়নি তার। কিন্তু আজ এই ভ্যানঅলার পাশে দাঁড়িয়ে সে নিশ্চিতভাবেই অনুভব করে যে রাতের একটা আলাদা গন্ধ আছে। নিয়মিত রাতচরা লোক যারা, কেবল তাদের শরীর থেকেই বের হয় গন্ধটা। রাতের রিক্সাঅলা, পাহারাদার, বেশ্যাদের শরীর শুঁকলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এই একই গন্ধ। একটা আবিষ্কারের উত্তেজনা, সামান্য হলেও ভর করে বাদলের মনের ওপর।

ভ্যানঅলা আর কোনো প্রশ্ন না করেই তাদের উদ্দেশ্য করে বলে– উঠেন।

এবার লোকটাকে দেবদূত-প্রেরিত কোনো বাহনের চালক বলে মনে হয় বাদলের। সে মাকে ধরে ওঠায় ভ্যানের সামনের বামদিকে। তারপর নিজে উঠতে উঠতে বলে– বাইপাসে যোগীর জঙ্গলের কাছে যাব।

জানি।

তার একথায় ভয়ানক চমকে ওঠে বাদল। লোকটা জানে কীভাবে?

জিজ্ঞেস করার আগেই প্যাডেল ঘোরাতে শুরু করেছে চালক।

বাদলের এইসব বিস্ময়, এইসব প্রশ্ন, কোনো কিছুই মাকে স্পর্শ করেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ঠোঁট নড়ছে অবিরাম। দোয়া ইউনুস পাঠ চলছে সেই সেদিন রাত থেকে। এই দোয়া একলক্ষ বার পড়লে নাকি কবরে বাস করা লাশেরও বিপদ কেটে যায়। মা তো ইতোমধ্যে লক্ষাধিকবার নিশ্চয়ই পড়ে ফেলেছে দোয়াটি। দুই বউকেও পড়তে তাগাদা দিয়েছে অবিরাম। তারা দুজনে মিলে নিশ্চয়ই আরও একলক্ষ বার পাঠ করেছে দোয়াটি। হাদিসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুশকিল আসানের প্রত্যাশা এখন করতেই পারে তারা। সেই কারণেই বোধহয় প্রায় অলৌকিকভাবে এই ভ্যানঅলাকে পেয়ে যাওয়া, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভ্যানঅলার তাদের বয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ভ্যানঅলা জানল কীভাবে যে তারা যোগীর জঙ্গলে যাবে? সে জিজ্ঞেস করার জন্য মাথা উঁচু করে। পেশল পিঠ দেখা যায়, যেহেতু খালিগায়ে রয়েছে ভ্যানঅলা। প্যাডেল ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওদিক একটু একটু আঁকাবাঁকা হচ্ছে ভ্যানঅলার শরীর। আর তার ফলে তার পিঠের পেশিগুলো এমন সুন্দর একটা পৌরুষ-ছন্দে কিলবিল করে উঠছে যে তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় বাদল। প্রশ্নটা হারিয়ে যায় তার মন থেকে কিছুক্ষণের জন্য। ভ্যানঅলার পিঠটাকে নিখুঁত শিল্পকর্মের মতো মনে হয় তার কাছে। মনে হয় জীবন্ত একটা ভাস্কর্য। কিছুক্ষণ সেই সৌন্দর্য দেখার পরে সামনের দিকে মুখ তুলে নিজের শহরকে দেখতে থাকে বাদল। তখন সে আবিষ্কার করে, নিজের শহর যে রাতের বেলা এতটা আলাদা, অচেনা মনে হতে পারে, আগে তার জানা ছিল না। সে ভ্যানের ওপর বসে থেকে একহাতে কাঠের রেলিংটা চেপে ধরে রাতের শহরকে দেখতে থাকে, আর চেনার চেষ্টা করতে থাকে। রাস্তার দুইপাশের সাইনবোর্ডগুলো দেখতে দেখতে মনে হয়, এই রাস্তা দিয়ে প্রত্যেকদিন অনেকবার করে চলাচল করলেও কোনো সাইনবোর্ডই তার ভালো করে পড়া হয়নি। পড়ার প্রয়োজনই বোধ করেনি সে। কেউই বোধহয় করে না। শুধু যে কয়টা দোকান বা জায়গা চেনার প্রয়োজন, সেই কয়টার ল্যান্ডমার্ক মনে গেঁথে রেখে বাদবাঁকি পুরো জনপদের কাছে অচেনা থেকেই বোধহয় তার মতো বেশিরভাগ মানুষই জীবন কাটিয়ে দেয়। দিনের বেলায় মানুষের ভিড়ে বোধহয় সবগুলো ঘর-দোকান-স্থাপনা আরো বেশি গায়ে গা লাগানো মনে হয়। সেই কারণেই সবগুলি ঘর, সবগুলি দোকান, সবগুলি স্থাপনার যে আলাদা আলাদা চেহারা আছে তা মনেই পড়ে না কারো। রাতের বেলা সবাই আলাদা আলাদা বিশিষ্টতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলেই বোধহয় তাদেরকে অচেনা মনে হচ্ছে। এমন তো নয় যে রাত বারোটার পরে, শহর জনশূন্য হয়ে পড়লে বাদল কোনোদিন পথ হাঁটেনি। কিন্তু তখন এমন মনে হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্যান বড় একটা ঝাঁকি খেলে সে সচকিত হয়। ভ্যানঅলা বলে– শালার সব ইস্কুলের সামনেত একখান করে কব্বরের সমান উঁচা ব্যারিকেড খাড়া করিছে। গাড়ি চালায়া সুখ নাই। সাবধানে শরীর চাপায় বসেন। নাহলে আছাড় খাওয়া লাগবি।

বাদল আলোজ্বলা সাইনবোর্ড দেখে ঠাহর করতে পারে তারা এখন গার্লস স্কুলের সামনে। স্কুলের গেটের সামনের রাস্তায় স্পিডব্রেকার। যাকে কব্বর বলছে ভ্যানঅলা। সাইনবোর্ড না পড়লে সে বোধহয় স্কুলটাকেও ঠিকমতো চিনতে পারত না। অথচ এই স্কুলের সামনের জলনিকাশী কালভার্টের পাড়ে বসেই কত সন্ধ্যা তাদের আড্ডা দিয়ে কেটেছে। বাদলের মনে পড়ে, বন্ধুদের সাথে সে প্রথম গাঁজায় দম দিয়েছিল এই কালভার্টের পাড়ে বসেই কোনো এক পড়ন্ত শীতের সন্ধ্যায়। সেই জ্বলন্ত স্মৃতির জায়গাও তার কাছে অচেনা মনে হচ্ছে! সে কি শুধু রাতের জন্য? না কি আজকের বিশেষ রাতে বিশেষ মানসিক অবস্থার জন্য?

নিজেকে যুক্তির আয়ত্তে নিয়ে আসার চেষ্টা করে বাদল। বুঝতে পারে, ভাইকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় সে স্বাভাবিক দিক-বিদিক ঠিক রাখতে পারছে না। মনের এই রকম ভগ্নদশা মোটেই কাম্য নয়। তাকে বরং এখন আরো বেশি মানসিক শক্তি ধারণ করতে হবে। কার্যকারণের সূত্রকে বেশি করে আঁকড়ে ধরতে হবে। না হলে খালেদের সন্ধানও পাওয়া যাবে না, নিজের মানসিক বৈকল্যও ঘটে যাবে। তাহলে তাদের এত দিনের এত পরিশ্রমের তিলে তিলে গড়ে তোলা সংসার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সে নিজেকে বাস্তবের মাটিতে আর সচেতনার জগতে নামিয়ে আনতে যায়।

ঠিক সেই সময়েই ভ্যানঅলা ব্রেক কষে। মুখে বলে– আইসা পড়িছি ভাইজান। কুন জাগাত নামবেন?

বাদলের মনে হয় বলে যে, এটাও তো তোমার জানার কথা। তুমি যেমন করে জেনেছ যে আমরা যোগীর জঙ্গলে যাব, সেরকম করেই তো জানা উচিত যে আমাদেরকে ঠিক কোন পয়েন্টে নামিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সে কথা না বলে গলা লম্বা করে বাদল পুলিশের পিকআপ খোঁজে। রাস্তার পাশেই তো ওটা দাঁড়িয়ে থাকার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। সে তখন মোবাইল বের করে পকেট থেকে। সাব-ইনসপেক্টর শাজাহানকেই ফোন করে জেনে নেওয়া হোক।

তখন দেখা যায় এগিয়ে আসছে পুলিশের পোশাক পরা একজন লোক। কাঠামো দেখে দূর থেকেই বাদল বুঝতে পারে এ লোক শাজাহান নয়। অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশি পৃথুল আর দোহারা লোকটা। হয়তো কোনো সেপাই হবে। ভ্যান থেকে নেমে মাকে পাশে নিয়ে পুলিশটার এগিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করে বাদল।

ওজনদার হলেও লোকটা হেঁটে আসে বেশ জোরে। কাছে এসে তাকায় মা-ছেলের দিকে। সম্ভবত মাকে সঙ্গে দেখে বিভ্রান্ত হয়েছে। অফিসার শাজাহানকে তো বলা হয়নি সে মাকে সঙ্গে নিয়ে আসছে। পুলিশ তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর গলা বাড়িয়ে রাস্তার এদিক-ওদিক তাকায়। অন্য কোনো লোক না দেখে বাদলকে জিজ্ঞেস করে– আপনারাই তো মীরবাড়ি থেকে আইছেন?

জ্বী। শাজাহান সাহেব আসতে বলেছেন। উনি কোথায়?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পুলিশটা বলে– আসেন আমার সাথে।

জায়গা থেকে না নড়ে আবার প্রশ্ন করে বাদল– উনি কোথায়?

পুলিশটা একবার করে তাকায় মা আর তার মুখের দিকে সোজাসুজি। অল্প আলোতেই বোধহয় পাঠ করে নিতে চায় বাদলদের মুখের ভূগোল। আস্তে আস্তে বলে– স্যার আমাক পাঠাইছে আপনাদের রাস্তা চিনায়া আগায়া নিতে। তানি আছে লাশের কাছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ গুমের পরিসংখ্যানে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি জায়গা দখল করে আছে রাশিয়ার স্তালিনের আমল।

সেলিমুজ্জামানের মুখে অনেকবার শোনা হয়েছে এমন কথা। সুযোগ পেলেই সমাজতান্ত্রিক আমলের রাশিয়া সম্পর্কে মুখ দিয়ে অবিরাম বিষ উগড়াতে থাকে সে। অথচ সে লেখাপড়া করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্কলারশীপ নিয়ে। এমদাদ ভাই রসিকতা করে বলে যে সেলিমের এই রাশিয়া-বিরোধিতা আসলে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কারণ। সে নাকি কোনো এক রুশ সুন্দরীর প্রেমে পড়েছিল। মেয়েটি তাকে পাত্তা দেয়নি। সেই দুঃখে ডিগ্রি শেষ না করেই দেশে ফিরে এসেছিল সে। আবার বেশি বিরক্ত হলে সেই এমদাদ ভাই-ই বলে যে শালা থার্ড সেমিস্টার পরীক্ষায় পাঁচবার ফেল করায় মস্কোর ইউনিভার্সিটি তাকে আর সুযোগ দেয়নি। ডিগ্রি ছাড়াই ফিরতে হয়েছে দেশে। চাকুরি নাই। সেই ক্ষোভ এখন সে ঝাড়ে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে।

যখন সে বিভিন্ন সময়, বিশেষ করে স্তালিনের আমলে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর অত্যাচারের ফিরিস্তি দিতে থাকে, তখন এমদাদ ভাই আফসোসের সাথে মাথা নাড়ে– এইসব ডাটা কালেকশন আর মুখস্ত করে করেই তুই পাঁচটা বছর কাটাইছিস মস্কোতে। এর বদলে কয়পাতা পড়াশুনা করলে ডিগ্রিডা পাওয়া যেত। জীবনটা অন্যরকম হতো রে সেলিম।

সেলিমুজ্জামান রেগে উঠে বলে– এটা কিন্তু পারসোনাল অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে এমদাদ ভাই।

পারসোনাল ফেইলিওরের কথা বললে তো পারসোনাল অ্যাটাক হবেই ভাই। যে দেশটা তোকে পাঁচ-পাঁচটা বছর খাওয়াল-পড়াল, তোর গাঁজা-ভদকা খাওয়ার পয়সা দিল, তোর ডেটিং করার খরচ দিল, সেই দেশে তুই একটাও ভালো জিনিস দেখতে পাস না। কোনোদিন সেই দেশ সম্পর্কে একটা ভালো কথা উচ্চারণ করলি না। সিআইএ-র ভাড়াখাটা এজেন্টও তো এইরকম মনোভাব দেখায় না রে সেলিম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি বুঝতে পারছ না এমদাদ ভাই, একটা দেশে যখন অনেক ধরনের পুলিশ বা আধা-পুলিশ বা এলিট পুলিশ বাহিনী বানানো হয়, তখন বুঝতে হবে, সেই রাষ্ট্রের সাথে জনগণের দূরত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

ঠিক। একদম ঠিক।

স্তালিনের আমলে কত রকম বাহিনী ছিল জানো? তোমরা তো খালি কেজিবি-র নামই জানো। কেজিবি-র চাইতেও খতরনাক অনেক বাহিনী ছিল সেখানে। চেকা, অগপু, এনকেভিডি– আরও কত বাহিনী। সবগুলোর নাম বোধহয় স্তালিনও জানত না।

যেমন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরাও বলতে পারে না আমাদের দেশের সবগুলি বিশেষ বাহিনীর নাম।

কীসের সাথে কী? রেগে উঠতে গিয়েও থমকে যায় সেলিমুজ্জামান। আসলে কথা তো ঠিকই। আমাদের দেশেও তো এখন রাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনীর সংখ্যা অনেক!

আর গুমের কথাই যদি বলিস তাহলে আমাদের দেশে একাত্তরের কথা ভুলে যাচ্ছিস কেন বাবা? তিরিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রস্তুত এক-তৃতীয়াংশই তো গুম। লাশ পাওয়া যায়নি কারো।

একাত্তরের কথা আলাদা।

হিটলারের জার্মানির কথাও আলাদা।

শাহের ইরানের কথাও আলাদা।

চিলির কথাও আলাদা।

ফ্রাঙ্কোর স্পেনের কথাও আলাদা।

হ্যাঁ। স্বীকার করে এমদাদ– সব দেশের সব পরিস্থিতিই আলাদা আলাদা। তবে একটা জায়গায় মিল রয়েছে। তা হচ্ছে বারবার মানবতার আক্রান্ত হওয়া।

আলমগীর সরকারি দলের সাথে জড়িত। সে বলে– বারবার গুমের কথা আর সরকারি বাহিনীর কথা আসছে কেন? খালেদকে যে সরকারের লোক তুলে নিয়ে গেছে, তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? এটা তো কোনো কিলার গ্রুপ বা ভাড়াটে গ্রুপের কাজ হতে পারে। কিডন্যাপও হতে পারে।

হ্যাঁ তা হতে পারে। স্বীকার করে সকলেই। তবে...

তবে কী?

তবে সে কথা প্রমাণ করতে হবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেই।

মানে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানে খালেদকে উদ্ধার করতে হবে তাদেরই। ধরতেও হবে দুষ্কৃতিকারীদের। কেবলমাত্র তাহলেই প্রমাণিত হবে যে কাজটা সরকারের কোনো বাহিনী করেনি।

ঠিক।

হ্যাঁ। একেবারে ঠিক।

সেই কাজটা তো চলছে। পুলিশ করছে কাজটা। অভিযান চালাচ্ছে নানা জায়গায়। সন্ধান চলছে খালেদের।

কিন্তু আমাদেরও তো যথাসাধ্য কিছু করা দরকার।

কী করব আমরা?

কী করতে পারি আমরা?

এই প্রশ্নে সবার ভেতরের অসহায়তা একেবারে প্রকট নগ্ন হয়ে যায়। আসলেই তো কী করার আছে রাষ্ট্রের একজন সাধারণ মানুষের!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলেন। ডেডবডির কাছে যাই।

শব্দটা শোনামাত্র নিজেও টলে উঠেছিল বাদল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে চট করে মায়ের পাশে চলে যায়। মায়ের প্রতিক্রিয়া কী হবে জানে না। তাই অন্তত সতর্কতার জন্য তাকে মায়ের পাশে দাঁড়াতে হয়।

এই ম্লান আলোতেও দেখা যাচ্ছে মায়ের মুখ ব্লটিং পেপারের মতো সাদা শুকনো হয়ে গেছে। বাদল একহাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। থরথর করে কাঁপছে সে নিজেও। তার শরীরের সাথে যোগ হয় মায়ের কাঁপুনিও। তবে বাদলের আগেই মা সামলে নিতে পারে নিজেকে। তার শরীর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একটা হাত চেপে ধরে। একেবারে স্পষ্ট কিন্তু অনুচ্চ স্বরে বলে– চল!

বাদল আরো একবার অনুভব করে সমাজ-সংসারের সব বিষ হজম করার ক্ষেত্রে মায়েরাই সবচেয়ে আগে আগে প্রস্তুত হয়ে যায়। সংসারের সকল ঝড়ে সবার আগে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারে মায়েরাই। মায়ের মোলায়েম মুঠি বেশ শক্ত করে চেপে ধরে বাদলের হাত। কিঞ্চিৎ চাপ দিয়ে বলে আবার– চল!

পুলিশের পিঠ এবং পা দুটোকেই কেবল অনুসরণ করতে থাকে তারা। পরিপার্শ্বের অন্য সবকিছুই অদৃশ্য হয়ে গেছে বাদলের চোখের সামনে থেকে। তাই তারা বাইপাস রোড থেকে নেমে কোনদিকে যাচ্ছে কিছুই মনে করতে পারে না। মনে করার প্রয়োজনও বোধ করে না। বাতাস আসছে। একটু পর পর রাস্তার ডান থেকে বামদিকে বয়ে যাচ্ছে বাতাসের একটা করে ছোট ছোট ঢেউ। কিন্তু বাদল ঘামছে। তারপরে হঠাৎ একসময় ঘাম বেড়ে যায়। তখন দুপাশে তাকায় বাদল হারিয়ে যাওয়া বাতাসের সন্ধানে। বাতাস গেল কোথায়? চোখে পড়ে দুইপাশে সারি সারি ঝাঁপবন্ধ দোকান। দুই দোকানের মাঝখানে বেড়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলার মতো এক চিলতে ফাঁকও নেই। বাতাস আসবে কোন দিক দিয়ে। কাজেই তাকে আরো বেশি ঘেমে উনে উঠতে হয়।

হঠাৎ করেই রাস্তা শেষ হয়ে যায়। দুইপাশের ঝাঁপবন্ধ দোকানগুলোও উধাও। দুইপাশে বা তিনপাশেই এখন খেত বিংবা মাঠ। পুলিশ নেমে যায় আলপথে। এখন তার হাতে একটা টর্চ। এখন আর পাশাপাশি হাঁটার মতো পথ নেই। তাই তাদের লাইনবন্দি হয়ে এগুতে হয়। আগে টর্চহাতে পুলিশ, তার পেছনে বাদল, তার পেছনে মা। পুলিশ আস্তে হাঁটতে পারে না। মা জোরে হাঁটতে পারে না। বাদল পুলিশ না মা কাকে প্রাধান্য দেবে ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত মায়ের সাথেই থেকে যায়। টর্চহাতে অনেকটা ফারাক তৈরি করে আগে চলে গেছে পুলিশ। এতটাই দূরত্ব তৈরি হয়েছে যে পুলিশকে নয়, তার হাতের টর্চের আলোটাকেই দেখা যাচ্ছে শুধু। তবু আস্তে আস্তে পা চালিয়ে আলপথে হাঁটতে পারছে তারা। কারণ রাতশেষের মরন্ত আলো এখন আলপথ আর নাবিজমিকে আলাদা আলাদাভাবে চিনিয়ে দিতে পারছে।

মায়ের ফোঁশ ফোঁশ কান্নার শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। বাদলও ফোঁশ ফোঁশ করছে। বেদনায়, উত্তেজনায় এবং ক্লান্তিতে।

পুলিশটা অনেকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বোধহয় এতখানি ফারাক তৈরি হবার পরেই সে বুঝতে পেরেছে যে বাদল এবং তার মা বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। সে আলোহাতে দাঁড়িয়ে আছে গন্তব্যের দিকে পেছন ফিরে বাদল এবং তার মায়ের কাছাকাছি পৌঁছানোর অপেক্ষায়। টর্চের আলো ফেলে রেখেছে আলপথের ওপর বাদলদের পায়ের কাছে। কাছাকাছি পৌঁছানোর পরে আশ্বাসের সুরে পুলিশ বলে– এই এসে গেছি। আর বেশি দূর না।

পথ কমে এসেছে। লাশের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পথ। এই পথটুকু পাড়ি দেবার পরেই কি তারা পৌঁছে যাবে অনন্ত শোকের রাজ্যে?

হাঁটতে হাঁটতে একসময় মানুষের সাড়াশব্দের মধ্যে এসে পৌঁছায় তারা।

সাব-ইনসপেক্টর শাজাহান সামনে এসে দাঁড়ায়। এত রাত, এত ম্লান আলো, এত বিষাদের মধ্যেও তাকে দেখতে সেই সকালের মতোই স্মার্ট ঝকঝকে। বাদলের সঙ্গে মাকে দেখেও ভাবান্তর হয় না কোনো। বলে– আসুন। অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হলো আপনাদের। কিন্তু কী করব বলুন। সুরতহাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত আমরা ডেড... মানে ভিকটিমকে সরিয়ে নিতে পারি না। আসুন।

তাদের নিয়ে একটা গর্তমতো নিচুজমির দিকে এগুতে এগুতে সে বলে– সরি! আমরা রিয়েলি সরি! কিন্তু কী করব বলুন! আমরা যতই সক্রিয় থাকে না কেন, কিছু না কিছু ঘটনা ঘটেই যায়। অপরাধকর্মও বোধহয় প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মতোই অবশ্যম্ভাবী।

নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য দার্শনিক বুলি কপচায় সকলেই। কিন্তু এখন সেসব নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করে না বাদলের। নিঃশব্দে অনুসরণ করে শাজাহানকে।

নিচু জায়গাটির কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় সে। এখানে অনেক আলো। টর্চের আলো, চার্জার বাতির আলো। সেই আলোতে দেখা যায় আধা কাত আর আধা উবু হয়ে পড়ে আছে একটা যুবকের শরীর। পরনে ট্রাউজার। খালি গা। পিঠ এবং কাঁধের একটা বড় অংশ দেখা যাচ্ছে। গায়ের রং বোঝার উপায় নেই। কারণ চামড়ায় রক্ত আর কাদা লেপ্টে আছে পুরু হয়ে।

তার দিকে অ্যাপোলজি চাওয়ার ভঙ্গিতে তাকায় শাজাহান। বলে– আমি তো খালেদকে চিনি না। দেখিনি কোনোদিন। কিন্তু আপনাদের দেওয়া বর্ণনা শুনে মনে হয়েছে এটা খালেদ হলেও হতে পারে। সেই কারণেই এই রাতের বেলা কষ্টটা দিলাম। ধরেন যে আপনাদের দিয়ে সনাক্তকরণের ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বাদল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

শাজাহান একটু তাড়া দেয়– যান। কাছে গিয়ে দেখুন। ভয় নাই!

বাদল সেই নিচুজমি বা গর্তের দিকে এগোতে গিয়ে সশব্দে অবাক হওয়ার মতো করে দেখতে পায়, সেই রক্ত এবং কাদামাখা ডেডবডির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে তার মা। মা কখন নিঃশব্দে পৌঁছে গেছে লাশের পাশে! বাদলের মতো শাজাহানও একটু থমকায়। তারা দুইজনে এগিয়ে চলে লাশের দিকে। এক, দুই, তিন করে ধাপ গুনতে থাকে বাদল। তার হাঁটুতে জোর নেই। মনে হচ্ছে অনন্ত সময় ধরে সে হাঁটছে লাশের পাশে পৌঁছানোর জন্য। এই পথ শেষ হচ্ছে না কেন? মা কীভাবে এত চটজলদি পৌঁছে গেল সেখানে? তারপরে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, মায়েরা মা বলেই এমনটা পারে। কিন্তু সে ভাই হয়ে পারছে না কেন? শাজাহান বোধহয় তার অবস্থা বুঝতে পারে। সে বাদলের হাত চেপে ধরে তাকে এগিয়ে নিতে থাকে।

তারা কাছে গিয়ে পৌঁছাতেই মা উঠে দাঁড়ায়। চিরাচরিত নিচু, নিষ্কম্প এবং দৃঢ়স্বরে বলে– এটা খালেদ নয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদল আবার এসে দাঁড়ায় তাদের শহরের সেই পুরনো অংশে যার কথা জানে না তাদের জনপদের কেউ।

আগেরবার বাড়িঘর-রাস্তা-লোকজন কোনোকিছুই তার চেনা শহরের চিত্রের সাথে মিলছিল না। কিন্তু এখন এই দ্বিতীয়বারে তার আর এখানে আগন্তুক মনে হচ্ছে না নিজেকে। এই এলাকার কিছু অংশ অন্তত তার চেনা। যদিও আগের বারের মতোই এবারও তার মনে হচ্ছে যে এই এলাকার পুরোটাই তার চেনা। এখানে কোথায় কী আছে সবকিছুই তার জানা। সে কীভাবে জানল এসব? মাথার ভেতরে একবার আবছা উঁকি দিয়ে যায় দুটি বিশ্ববিখ্যাত নাম। ওরহান পামুক। এবং কার্লোস ফুলেন্তস। তাহলে সে কি তার নিজের শহরে নয়, হেঁটে বেড়াচ্ছে ইস্তাম্বুলের পুরনো এশীয় অংশে, নাকি মেক্সিকো সিটির প্রাচীন দোনসেলেস স্ট্রিট এলাকায়? এই চিন্তার কুহক তাকে অনেকখানি বিভ্রান্ত করলেও সে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে নির্ভার করতে পারে এই বলে যে সে এসেছে তার ভাইয়ের খোঁজে। ভাইকে খুঁজে পেলেই তার চলবে। সে তার নিজের শহরে হোক, পুরনো ঢাকায় হোক, ইস্তাম্বুলের গরীবতর এশীয় অংশে হোক, আর মেক্সিকো সিটির পরিত্যক্ত অংশে হোক। ভাইকে খুঁজে পাওয়া দিয়ে কথা তার! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ভাইকে খুঁজে পাওয়া। আর প্রায় তার সমানই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই এলাকায় জীবনে পা না পড়লেও সে সবকিছু চেনে। অতএব তন্ন তন্ন করে খুঁজতে তার অসুবিধা হবে না।

আগের বারের মতোই সে আস্তে-ধীরে শহরের ছাল-বাকলা ওঠা রাস্তা দিয়ে নির্দিষ্ট একটা দিকে এগিয়ে চলে। এবারও কেউ তাকে বলে দেয়নি কোন দিকে হাঁটতে হবে। কিন্তু সে নিশ্চিত জানে, তাকে কোন দিকে যেতে হবে। দুইধারের লেদ মেশিনের কারখানা, পান-সিগারেটের চিপা দোকান, বাসি বিরিয়ানি আর ডালপুরি-চায়ের দোকান, সাইকেল-রিক্সার চাকায় হাওয়া দেওয়ার সিলিন্ডারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ দিয়ে সে হেঁটে চলে। তবে এবার এসবের সাথে আরেকটা নতুন দোকান যোগ হয়েছে দেখতে পায় সে। শিশুদের প্লাস্টিকের খেলনার দোকান। সে দোকান পেরিয়ে হেঁটে চলে। হেঁটে চলে মানুষ, রিক্সা, সাইকেল, হোন্ডা, কখনো কখনো প্রাইভেট কারের সাথে ধাক্কা খাওয়ার উপক্রম করে করে, অথচ একবারও ধাক্কা না খেয়ে। কোথাও না থেমে একবারে এসে দাঁড়ায় সেই একই গলির সামনে। নিশ্চিত জানে এই গলির মধ্যেই রয়েছে সেই বাড়িটা। কোনোমতে একজন নিজেকে ঢুকিয়ে দিতে পারে, এমন একটা সরু গলির সামনে সে দাঁড়ানো এখন। সে জানে এই গলির ভেতরে ঢুকলে পাওয়া যাবে একটা টিনের পাত বসানো কাঠের গেট। গলির মধ্যে ঢুকতেই বাইরের উজ্জ্বল আলো হঠাৎ-ই হারিয়ে যায়। সে মাথার ওপরের আকাশের দিকে তাকায়। গলির ওপরটা তো ঢাকা দেওয়া নেই। তাহলে হঠাৎ অন্ধকার এল কোত্থেকে! আকাশের দিকে তাকালে রহস্যটা বোঝা যায়। আকাশকে যেন হঠাৎ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া মোমবাতির মতো লাগছে। অথচ একধাপ পেছনে গলির মাথায় মালখান স্ট্রিট বা দোনসেলেস স্ট্রিটে পা দিলেই আকাশ ধারালো রোদে তলোয়ারের মতো ঝকমকে। তাহলে কি স্ট্রিটের আকাশ আর এই গলির আকাশ আলাদা? স্ট্রিট থেকে গলির মধ্যে পা দেওয়ার মানেই কি আরেকটা পৃথিবীর শুরুতে পা দেওয়া? এসব চিন্তা তার আষাঢ়ের মেঘের মতো তার মাথায় একের পর এক ভর করতে থাকলেও পায়ের প্রতিটি ধাপকে অটলটলায়মান রেখেই গলিপথ হেঁটে টিনের পাত-মোড়ানো পচতে শুরু করা কাঠের গেটের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। দরজা বন্ধ। সে কলিং বেলের খোঁজে একটু এদিক-ওদিক তাকায়। কোনো কলিং বেল নেই। এমনকি দরজাতে কোনো কড়াও নেই যে নাড়বে। সে তখন ডান হাতের তিনটে আঙুলের উল্টাপিঠ দিয়ে কাঠের ওপর টোকা দেয়। ভেজা কাঠ কিংবা কাঠবোর্ডে টোকা দিলে যেমন হয়, সেই রকম ঢব ঢব শব্দ ওঠে। একটু ভয় পায় সে। বোধহয় কাঠ একেবারেই পচে গেছে। জোরে হাতের থাবড়া দিয়ে অওয়াজ করতে গেলে কাঠের গায়ে গর্ত হয়ে হাত ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। কী করবে বুঝতে না পেরে সে দুই হাতের তেলো সমানভাবে কাঠের গায়ে বসিয়ে একটু ধাক্কা দেয়। তখন সবিস্ময়ে খেয়াল করে যে দরজা ভেতর থেকে খুলে দেবার জন্য কোনো ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজনই নেই। কারণ দরজা আসলে খোলা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবলমাত্র পাল্লাদুটো পরস্পরের গায়ে ভেড়ানো।

আগের বারের মতোই পাল্লা ঠেলে সে বাড়ির ভেতরে পা রাখে। তবে এবার সে অনেক বেশি সতর্ক এবং নিশ্চিত। অন্ধকার এখানে তত প্রবল নয়। অন্ধকারের সাথে কিছুটা আলো মেশানো রয়েছে। ফলে অন্ধকারের অস্বস্তি তার কেটে যেতে থাকে। কিন্তু স্যাঁতসেতে একটা অনুভূতি তাকে জড়িয়ে ধরতে শুরু করে। ঘাড়ের পেছনে এবং মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ যেন। মনে হচ্ছে সূর্যের আলো ক্বচিৎ-কদাচিৎ ঢুকতে পারে এমন একটা পাহাড়ের গুহায় শ্যাওলা মাখা মেঝেতে বসে আছে সে। জোরে হাঁটলে উষ্ণতা বাড়বে মনে করে সে দ্রুত পা চালায়। অনভ্যাসের কারণে অচিরেই বিনবিনে ঘাম ফুটে ওঠে বগলে জামার তলায়, সেইসঙ্গে শ্বাসলয় বেড়ে যায় দ্বিগুণের বেশি। ফলে এতই দ্রুত সে আলো-অন্ধকার মেশানো জায়গাটুকু পেরিয়ে একটা টানেলের মতো বারান্দার সামনে পৌঁছে যায় যে নিজেও হকচকিয়ে ওঠে। এসব যে ঘটবে জানা ছিল তার। তবু সে হকচকিয়ে যায় আগের বারের মতোই। এখানে অন্ধকার অনেক ঘন। অথচ সিলিংয়ে ন্যাড়া একটা ষাট-চল্লিশ ওয়াটের বাতি ঝুলছে। কিন্তু এত পোকা সেটিকে নিশ্ছিদ্রভাবে ঘিরে রয়েছে যে একবিন্দু আলোও বাইরে আসতে পারছে না। এই সময় সে বিকল্প আলোর সন্ধান করে মনে মনে। তখনই মনে পড়ে যে তার পকেটে মোবাইল ফোন রয়েছে। সেটিকে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যেতে পারে আলোর উৎস হিসাবে। পকেটে হাত দিয়ে মোবাইল বের করামাত্র সেটি বেজে ওঠে তাকে ঈষৎ চমকে দিয়ে। কানে তুলতে ভেসে আসে আগের বারের মতোই একটি ক্লান্ত নারীকণ্ঠ– কোনো দরকার নেই মোবাইলের টর্চ জ্বালানোর। আপনি পৌঁছে গেছেন প্রায়। সোজা হাঁটুন সামনের দিকে। বাইশ পা হাঁটার পরে ডান দিকে ঘুরবেন। সিঁড়ি উঠে এসেছে। মোট তেরো ধাপ। সিঁড়ি দিয়ে উঠে নাক বরাবর যে দরজাটা আছে, সেটা খুলতে পারলেই আপনার আকাঙ্ক্ষা পুরণ হবে। কিন্তু সাবধান, শব্দ করলেই পাহারাদাররা...

কথা শেষ না করেই মোবাইল স্তব্ধ হয়ে যায়। সে চাপাস্বরে বারদুয়েক হ্যালো হ্যালো করে মোবাইল পকেটে রেখে দেয়। তারপর নির্দেশমতো পা চালায়।

বলা হয়েছে শব্দ করা যাবে না। তাই সাবধানতার আতিশয্যে তার নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়ের সামান্যতম ঘষটানির শব্দও তার কাছে গির্জার ঘণ্টার মতো ঝনঝন করে বাজে। আর প্রতিবারই সে ভয়ে কুঁকড়ে যায়। নিজের জন্য নয়, ছোটভাইয়ের জন্য ভয়। যদি এতদূর এসেও তাকে পাওয়া না যায়!

আগের বারের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। পায়ের কাছ দিয়ে নিঃশব্দ বিদ্যুতের মতো কিছু একটা ছুটে যায়। সে আঁতকে উঠে এদিক-ওদিক তাকায়। দুটি জ্বলজ্বলে গোল আগুনে-আলো দেখা যায়। সে ভয় পাওয়ার আগেই চিনে ফেলে সেটাকে। বিড়ালের চোখ। এই বাড়িতে কি অনেক ইঁদুর আছে? তা নাহলে বিড়াল কেন থাকবে এখানে? আর ইঁদুর থাকা মানে তো ভয়ানক ব্যাপার। পুরোপুরি পরিত্যক্ত কোনো জায়গাতে ইঁদুর থাকে না। যেখানে তাদের নিয়মিত খাদ্যসংস্থান হয়, কেবল সেখানেই তারা থাকে। আর মানুষের শবদেহের চাইতে উপাদেয় খাদ্য তাদের কী হতে পারে! ভয়ের শীতল স্রোত তার মেরুদণ্ড বেয়ে নামতে থাকে। আর সেই ভয়ের কারণেই কি না সে ভুলে যায় কয়ধাপ হাঁটা হয়েছে ইতোমধ্যে। কী হবে তাহলে এখন?

একবার পেছন দিকে তাকায় সে। ঠিক কোন জায়গাটি থেকে তাকে বাইশ ধাপ গুনে হাঁটতে বলা হয়েছিল সেই স্থানবিন্দুটি ঠাহর করতে পারে না কিছুতেই। তখন তার ঘাম আরও বিপুল বেগে জামা-গেঞ্জি ভেজাতে থাকে। সে তখন মড়িয়া হয়ে পা বাড়ায়। একবার ইচ্ছা করে মোবাইলের টর্চ জ্বেলে সিঁড়িটা খুঁজে নেয়। কিন্তু সাবধানবাণীর কথাও মনে পড়ে। চরম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে আলো জ্বাললে।

কিন্তু এবারেও সর্বনাশ ঘটেই যায়। তার পায়ের নিচে চাপা পড়া একটা ধেড়ে লোমশ শরীর এত জোরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ওঠে যে মনে হয় বাড়ির মধ্যে লুকানো অ্যালার্ম বেগে উঠেছে। সে পা উঁচু করতেই ইঁদুরটা ছুটে পালায়। কিন্তু দুড়দাড় পায়ের শব্দ আসতে থাকে দোতলা থেকে, নিচতলার ডানপাশ থেকে, বামপাশ থেকে, এদিক-ওদিক অন্ধকার ফুঁড়ে জ্বলে উঠতে থাকে ছয় ব্যাটারির জোরালো টর্চের আলো। সেই আলো এবং তাড়া করে আসা শব্দের মধ্যে সে জনারণ্যে হঠাৎ ন্যাংটো হয়ে পড়া বিমূঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চল্টা-ওঠা সিমেন্টের মেঝেতে দুই পা গেঁথে। কেউ একজন এসে পড়েছে একেবারে কাছে। একাধিক জন। একাধিক দিক থেকে। সে তাই কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সবচেয়ে কাছে এসে পড়েছে পেছনের একজন। পিঠের ওপর বিশাল এক থাবড়া এসে পড়ে। সে হুমড়ি খেয়ে পড়া থেকে বাঁচার জন্য বাতাসে দুই হাত এলোমেলো আছড়ায়, পড়বে না প্রতিজ্ঞা করেও দুইপায়ের ওপর টলমল করে। এবার জোরে কেউ পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। খুব জোরের ধাক্কা। কিন্তু আগের বারের মতো সে এবার আর লুটিয়ে পড়ে না মেঝেতে। সে জানে কমপিউটার গেমের মতো এই ধাপ তাকে এবার পার হতেই হবে। নিজের মনের মধ্যে সে একটা কী-বোর্ড সাজিয়ে নেয়। কখন কোথায় চাপ দিতে হবে সে এখন জানে। জানে এই মুহূর্তে তার শারীরিক পতন ঘটা চলবে না। কিন্তু কীভাবে এড়াবে সে এই বিপর্যয়?

কানের কাছে কে যেন বলে ওঠে– তুমি তোমার শরীরকে বাতাসের সাথে মিশিয়ে দাও।

তা কী করে করা যায়?

তুমি করতে চাইলেই হবে।

সে মনের মধ্যে সাজানো কী-বোর্ডের একটা বোতামে চাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় বিশাল অদৃশ্য হাতের থাবড়াগুলো কোনোটাই আর তার শরীরকে স্পর্শ করতে পারছে না। তার শরীরকে ভেদ করে টানেলের মতো বারান্দার বাতাসে এলোমেলো আঁকিবুকি কাটছে।

পেরেছ! তুমি পেরেছ!

এবার তুমি এগুতে পারো সামনের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকো।

সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। কোনো রেলিং নেই। শুধু দুইদিকের দেয়াল ফেঁড়ে তৈরি করা সংকীর্ণ সিঁড়ি। দুপাশের দেয়ালে নানারকম লতানো ভেষজ। একটাও এদেশী নয়। কিন্তু সে সবগুলোকেই চিনতে পারে। সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে খোরাসানি ঘুমপাড়ানিয়া ঔষধির দীঘল, ছড়ানো, রোমশ একটার পর একটা পাতা। রয়েছে বাইরে থেকে হলুদ, ভেতরে ভেতরে লাল, তীক্ষ্ণ হৃৎপিণ্ডের মতো বেলেডোনা। থোকা থোকা ফুল নিয়ে ধূসর রোঁয়ালাগানো দ্রাক্ষাডুমুর। মাকড়শার আদলের ঝোপ আর সাদা মুকুল নিয়ে বিষকাঁটালি।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আগের মতো একই চিন্তা করে সে। এইসব ভেষজ কেন দেয়ালজুড়ে বুনে রাখা হয়েছে? তাহলে কি ভাই তার অসুস্থ? নির্যাতনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্যাতনে বিপর্যস্ত? তাহলে তো এগুলো তার শুশ্রূষার জন্য কাজে লাগবে। সে ভাইয়ের অসুস্থতার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার পাশাপাশি ভুলে যায় যে তাকে কোনো কিছুতে হাত লাগাতে নিষেধ করা হয়েছিল। ঝটপট বেলেডোনার ঝাড় টান দিয়ে উপড়ে নিতে যায় সে। আর কল্পনায় নয়, এবার সত্যিসত্যিই বিকট শব্দে ঝন ঝন করে বেজে ওঠে অ্যালার্ম। বাজতেই থাকে জেলখানার পাগলাঘণ্টির মতো। মুহূর্তের মধ্যে শরীরী এবং অশরীরী বডিবিল্ডার পাহারাদারে ভরে যায় সমস্ত বাড়ি।

ভাইয়ের কাছে আর কোনোদিনই পৌঁছাতে পারবে না বাদল!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~